রত্নহার রহস্য

নিখিল সেন

সাহিত্যলোক ॥ ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট ॥ কলিকাতা-৭০০০০৬

স্নেহের ঋতুপর্ণা ও ঋতুশ্রী-কে

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য রচনা

শ্রীমতী ভয়কংরী (উপন্যাস)
কনেবিভ্রাট (উপন্যাস)
পরমপ্রেমী (উপন্যাস)
কাঞ্চন অভিলাষ (উপন্যাস)
প্রতিনিয়ত (উপন্যাস)
পাপ অপাপ (উপন্যাস)
ব্ল্যাকপ্রিন্স (রহস্য উপন্যাস)
নির্মলেরা খুন হচ্ছে (রহস্য উপন্যাস)
পঞ্চশর (রহস্য উপন্যাস)
ত্রিভুজে রক্তের দাগ (রহস্য উপন্যাস)
নিখোঁজ নায়িকা (রহস্য উপন্যাস)

লেখকের অন্যান্য প্রকাশিত রচনা

গ্রীক প্রেমকথা
গ্রীক ট্র্যাজেডি
শতরূপে নারী
স্বৈরিণী
পঞ্চম পিতা (রহস্য উপন্যাস)
পাপড়ি রহস্য (রহস্য উপন্যাস)
আয়তি নিরুদ্দেশ (রহস্য উপন্যাস)
প্রেমিকের মৃত্যু (রহস্য উপন্যাস)
অশান্ত শান্তনীড় (রহস্য উপন্যাস)
খুনটা হ'তে পারতো (রহস্য উপন্যাস)
তখন রাত বারোটা (রহস্য উপন্যাস)
পরগাছা (রহস্য উপন্যাস)
ভাঙ্গাদুর্গ ভয়ংকর (ছোটদের রহস্য)
কেয়াতলার কাপালিক (ছোটদের রহস্য)
নির্ভিক সমিতি (ছোটদের একাঙ্ক)
সংকার (একাঙ্ক)
আঁধার সীমানায় (শ্রুতি নাটক)
খাঁচার পাখি (নাটক)
পদ্ম পাতায় জল (নাটক)
ওলট পালট (একাঙ্ক)
এই আমি (একাঙ্ক)
মধুরেণ (নাটক)
ছন্দপতন (নাটক)
কনে বিভ্রাট (নাটক)
শ্রীমান নাবালক (নাটক)
আশা নিরাশা (একাঙ্ক)
নো প্রবলেম (নাটক)
রাজনিদ্রা (নাটক)
জুয়েল থীফ (ছোটদের একাঙ্ক)
নিহত শতাব্দী (একাঙ্ক)
আগন্তুক (শ্রুতিনাটক)
বউ কথা কও (নাটক)
নাতজামাই (নাটক)
রঙ্গ ব্যঙ্গ একাঙ্ক (একাঙ্ক সংকলন)
অশোকার অসুখ (প্রমীলা একাঙ্ক)
গোপন সত্য (রহস্য একাঙ্ক)

রত্নহার রহস্য

॥ এক ॥

অভিভাবকদের আপত্তি ছিল। কারণও ছিল যথেষ্ট।

তাতন, শুভ্র আর বৃন্দা একসঙ্গে থাকলেই অভিভাবকরা স্বাভাবিক কারণেই বেশ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। বন্ধু মহলে ওদের নাম 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স'। থ্রী মাস্কেটিয়ার্স একসঙ্গে মানেই কোন রহস্যময় কিছু ঘটতে চলেছে।

তিনজন সম্পর্কে এই মুহূর্তে কিছু বলে নেওয়া বোধহয় ভালো। তাতন, লেখাপড়ায় খুব একটা মারাত্মক না হলেও রেজাল্ট খারাপ করে না। কখনো ফেল করেনি। কিন্তু ওর সাধারণ বুদ্ধিটা ভীষণ প্রখর। যে কোন জিনিসের প্রতি ওর অদম্য কৌতূহল। কোন অস্বাভাবিক ঘটনাকে ও খুঁটিয়ে না দেখে ছাড়বে না। তার অন্তর্নিহিত সত্য এবং সন্তোষজনক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না পেলে ও কিছুতেই সেখান থেকে পিছপা হবে না। খুঁটিনাটি ব্যাপারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ওর একটা বিশেষ গুণ। এ গুণটা ও ধীরে ধীরে রপ্ত করেছে শখের গোয়েন্দা নীল ব্যানার্জির সাহচর্যে এসে। সঙ্গে সঙ্গে আউট নলেজটাও বাড়িয়েছে প্রচুর। নীল ব্যানার্জিকে ও নীলকাকু বলে ডাকে। বয়েসের বিস্তর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও নীল ব্যানার্জি ওকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখে। এমন কী দু-একটা রহস্যজনক তদন্তে ও তাতনকে সঙ্গে নিতে আপত্তি করেনি। স্বাভাবিক কারণেই থ্রী মাস্কেটিয়ার্সের দলনেতা হতে তাতনের কোন অসুবিধাই হয়নি।

শুভ্র কিন্তু প্রচন্ড মেধাবী। লেখাপড়ায় চৌখস। প্রতিবছরই এতদিন প্রথম কিংবা দ্বিতীয় হয়ে এসেছে। তাই বলে টিপিক্যাল গুডি বয় ও নয়। পড়াশুনো ছাড়া আর কিছু করব না এমন ধনুকভাঙা পণ ওর নেই। বরং ঠিক উল্টোটা। পড়ে কম, আড্ডা দেয় বেশি, কিন্তু পরীক্ষায় দারুণ সফল। ওর সব থেকে বড় গুণ, বলা যেতে পারে এটা ওর জন্মগত ক্ষমতা, কোন কিছু একবার শুনলে বা দেখলে তা কোনদিনও ভোলেনা। অসম্ভব স্মরণশক্তি। বন্ধুরা বলে ও একটি স্মৃতিধর। পাঁচ বছর আগের কোন সূক্ষ্ম ঘটনাও ও ভুলে যায় না। একবার শ্যামবাজারে ওর এক বন্ধুর বাড়ি থেকে ফেরার সময় একটা দশ-এগারো বছরের ছেলেকে অশৌচের কাপড় পরে 'বাবা মারা গেছে' বলে ভিক্ষে করতে দেখেছিল। সেদিন

ছেলেটাকে দেখে শুভ্রর খুব খারাপ লেগেছিল। ও একটা পাঁচ টাকার কয়েন ছেলেটার হাতে দিয়ে দিয়েছিল। তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। দু' তিন বছর তো হবেই। কৃষ্ণনগর লোকালে বড় পিসীর বাড়ি থেকে কলকাতা ফিরছিল। হঠাৎ ট্রেনে একটা ছেলেকে দেখেই ও চমকে উঠেছিল। সেই একই রকম কোরা কাপড় পরা। গলায় নতুন কাপড়ের ফালি থেকে চাবি ঝুলছে। 'বাবা মারা গেছে' বলে সেদিনও সকলের কাছ থেকে সে চাঁদা তুলছে। শুভ্র ছেলেটা এমনিতে খুবই নির্বিবাদী। কিন্তু হঠাৎ ওর মাথায় রক্ত চড়ে গেছিল। কারণ, ওর স্মৃতিতে ঐ মুখটা আঁকা হয়ে গেছে দু' তিন বছর আগেই। এক নিমেষে শুভ্র ছেলেটার সামনে গিয়ে ঠাস্ করে তার গালে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'মিথ্যে কথা বলার জায়গা পাও না? একটা লোকের বাবা ক'বার মরে?'

ছেলেটা প্রথমে একটু তম্বিতম্বা করতে চেয়েছিল। কিন্তু সারা ট্রেনের লোককে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে ছেলেটা নিরুপায়ের মতো কিছুক্ষণ শুভ্রর দিকে তাকিয়ে চুপ করে গিয়েছিল। তারপর পরের স্টেশনেই...

ব্যাপারটা পরে শুভ্রর খুবই খারাপ লেগেছিল। ছেলেটা হয়তো মিথ্যে কথা বলেছিল। কিন্তু মানুষের কত রকম পেশা থাকে। কত রকম ফন্দিফিকির করে পেট চালাতে হয়। এটাও একরকমের ফন্দি, পয়সা রোজগারের। হয়ত ওর আর কোনভাবে বাঁচার উপায় নেই। শুভ্র তারপর মনে মনে ঠিক করেই রেখেছে, ছেলেটার সঙ্গে আবার যদি কোনোদিন দেখা হয়, ওর ব্যবহারের জন্যে ক্ষমা চেয়ে নেবে। কিন্তু ছেলেটাকে আর কোনোদিনও দেখতে পায়নি।

বুম্বার অবশ্য ওদের দু'জনের মতো বুদ্ধিটা অত প্রখর নয়। লেখাপড়াতেও খুব একটা ব্রাইট বলা যায় না। তবে খেলাধুলো, শারীরিক শক্তি বা যে-কোনো বিপজ্জনক অবস্থার মোকাবিলা করতে ও একাই একশো। নিয়মমতো ব্যায়াম করা, ক্যারাটে প্র্যাকটিস করা না হলে ওর ঘুমই আসে না। তিনজনেই এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল। সামনে এখন কম করেও তিন মাসের লম্বা ছুটি। তিন বন্ধুর আগে থেকে ঠিক করাই ছিল, পরীক্ষার পর ওরা ইভ্‌নিং শোতে চার্লি চ্যাপলিনের মডার্ন টাইমস্ দেখতে যাবে। কতদিন আগের ছবি। আজও তা মডার্ন।

চারটে নাগাদ ওরা তিনজনে বেরিয়ে পড়ল। হাতে ছিল অনেক সময়। এসপ্ল্যানেডে নেমে অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করল। বিদেশি জিনিস নিয়ে বসা হকারদের নানান ধরনের পশরা দেখতে দেখতে বেশ খানিকটা সময় কাটিয়ে, গেল নিজামে খেতে।

মাটন্ রোলে কামড় দিয়ে হঠাৎ শুভ্র বলে উঠল, 'এখন কি করবি রে তাতন?'

তাতন প্রথমটা বুঝতে পারেনি, বলল, 'কি করব মানে, সিনেমা দেখব।'

'আরে না, আমি সেকথা বলছি না, বলছি টানা তিন মাস ছুটি, কলকাতায় বসে থাকতে তোর ভাল লাগবে?'

'খারাপ লাগবে কেন? চল্ না নীল কাকুর বাড়িতে। আলাপ করিয়ে দোব। এত সব ইন্টাররেস্টিং বই আছে, দেখে তোর তাক লেগে যাবে। নীল কাকু একটা দারুণ লোক। আলাপ হলেই বুঝতে পারবি। এ রকম বুদ্ধিমান লোক না হলে ভাল গোয়েন্দা হওয়া যায় না।

বুম্বা একটু উসখুস করে উঠল। কারণ ঐ সব গোয়েন্দাগিরি ওর মোটেই ভালো লাগেনা. বলল, 'তোর নীল কাকু খুব বুদ্ধিমান লোক তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা তো আর কেউ গোয়েন্দা হতে যাচ্ছি না। কী লাভ শুধু-শুধু ওই রকম কাজের লোকের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে ডিসটার্ব করা? তাছাড়া ভদ্রলোক হয়তো আমাদের তেমন ভাল চোখে দেখতে নাও পারেন।'

তাতন একটু হাসল, তারপর বলল, 'তুই নীল কাকুকে দেখিসনি, তাই ওকথা বলছিস। সময় যে তোর কোথা দিয়ে কেটে যাবে তা তোর ধারণায় নেই। তার ওপর কত বই—'

'ধুস্' বুম্বা সামান্য বিরক্ত হ'ল, 'আমার অত বই-টই পড়তে ভাল লাগে না। বরং তুই যদি বলতিস সৌরভ বা পি-কে'র সঙ্গে আলাপ করতে সেটা আমার অনেক বেশি ভাল লাগত।

শুভ্র এতক্ষণ ওর রোলেই ব্যস্ত ছিল। রোলের শেষাংশ মুখে পুরে কাগজটা দলা পাকিয়ে ফেলে দিতে-দিতে বলল, 'ছুটি কাটাবার আমি একটা প্রোপোজাল দিতে পারি। নীল ব্যানার্জী বা সৌরভ বা পি-কে'র থেকে খারাপ হবে না।'

'বেশ তো, বলনা, কী তোর প্রোপোজাল, বুম্বার উক্তি। কারণ ও গোয়েন্দা সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে চায়।

'ময়নাডাঙ্গার নাম নিশ্চয়ই শুনেছিস?'

তাতন বলল, 'হ্যাঁ, তোর মামার বাড়ি তো?'

'মামার বাড়ি বলার থেকে দাদুর বাড়ি বলাই ভাল। কারণ, আমার দাদু এখনও বেঁচে আছেন। তাছাড়া মামারা কেউ থাকেনও না সেখানে। বড়মামা কলকাতায় বাড়ি করেছেন। আর দুই মামা তো ভারতবর্ষের বাইরে। একজন জার্মানি, একজন লন্ডন।'

বুম্বা একটুতেই অধৈর্য হয়ে পড়ে। আসলে ও বরাবরই ছটফটে। রয়েসয়ে ওর কিছুই সয়না। ও বলল, তুই তো সাত কাণ্ড রামায়ণ ফেঁদে বসলি। আসল

কথাটা কী বল তো!'

'ময়নাডাঙ্গার জমিদারবাড়ির কালীপুজো একটা বিখ্যাত ব্যাপার। প্রায় দুশো বছরের পুরনো পুজো। এককালে দেশ-দেশান্তর থেকে লোক আসত মামাদের পূর্বপুরুষের ঐ পুজো দেখতে। প্রথম পুজোয়—শোনা যায়—ওয়ারেন হেস্টিংস নাকি ময়নাডাঙ্গার চৌধুরীবাড়ি পুজো দেখতে গিয়েছিলেন। এখন অবশ্য এলাহি কাণ্ড কারখানার কিছুই নেই। চৌধুরীদের সব গেছে, কিন্তু পুজোটা এখনও হয়। দশটা গ্রামের লোক এখনও চৌধুরীবাড়ির পুজো দেখতে আসে। যাবি নাকি? ছুটিটা কিন্তু মন্দ কাটবে না।'

'কিন্তু', বলে আবার বুম্বা ফ্যাঁক্ড়া তুলল, 'এখন কালীপুজো কোথায়? কালীপুজো তো টেস্টের আগেই হয়ে গেল।'

'না রে, ও পুজোর সঙ্গে চৌধুরীবাড়ির পুজোর কোনো সম্পর্ক নেই। এটা চৌধুরীদের নিজস্ব পুজো। এর পেছনে অনেক বড় ইতিহাস আছে। সে-সব পরে বলব। তবে বৈশাখ মাসের ঘোর অমাবস্যার রাতে চৌধুরীবাড়িতে দুশো বছর ধরে কালীর পুজো হয়ে আসছে। এর পর কী হবে জানি না। তবে বড় দাদু যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন নিশ্চয়ই পুজো চলবে। তাই বলছিলাম—'

তাতন বলল, 'তোর দাদুর এখন বয়েস কত?'

'প্রায় সত্তর।'

'তাহলে তো এ সুযোগ ছাড়া যায় না। মানে, তোর মামাদের সম্বন্ধে যা বললি তাতে করে মনে হয় না বেশিদিন চৌধুরীবাড়ির পুজো চলবে। তোর দাদুর পর হয়তো পুজো বন্ধ হয়ে যেতে পারে।'

'তা নাও হতে পারে। ছোট দাদু তো এখনও বেঁচে আছেন। তবে শুনেছি, তিনি নাকি ঘোর নাস্তিক। তখন পুজোর কী হাল হবে জানি না। তবে আপাতত আমাদের ছুটিটা মন্দ কাটবে না তা বলতে পারি। তাছাড়া বেশি দূর তো নয়। ভাল না লাগলে চলে আসব।'

'কিন্তু বাড়ি কী একা-একা আমাদের ছাড়বে?' বলে বুম্বা দুই বন্ধুর দিকে তাকাল।

'কেন? না-ছাড়ার কী আছে? আমরা কী হারিয়ে যাব?' বেশ ভারিক্কী চালেই তাতন বলল, 'জানিস, আমরা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছি। আমাদের বয়েস এখন সতেরো।'

'কে তা মানছে ভাই! ও যতই ক্যারাটে শিখি আর বি.এ., এম.এ. পাশ করি,'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুম্বা বলল, 'অভিভাবকদের চোখে আমরা সর্বদাই ছোট ছেলে।'

'ম্যানেজ করতে হবে,' বলে তাতন উঠে পড়ল। আর দুই বন্ধুও উঠল।

রাস্তায় নেমে তাতন বলল, 'কিন্তু চৌধুরীবাড়ির ইতিহাস? সেটা তো শোনা দরকার।'

'বলব। ট্রেনে উঠে, ট্রেন লেট-টেট না করলে—বাবার মুখে শুনেছি, তিন ঘণ্টা সময় লাগবে যেতে। নে তাড়াতাড়ি চল্। পৌনে পাঁচটা বাজে, অনেকটা রাস্তা হাঁটতে হবে।'

॥ দুই ॥

আর তখনই অভিভাবকদের আপত্তি এই তিন মহাশয় একসঙ্গে এবং বড় কাউকে না নিয়ে ট্রেনে চেপে যাবেন কোন এক অজ পাড়াগাঁয়ে। ট্রেনে উট্‌কো বিপদ তো আছেই তার ওপর গাঁয়ে-গঞ্জে সাপটাপ থাকতেই পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভিভাবকদের রাজি হতেই হল। শুভ্র ওর দাদুকে চিঠি লিখেছিল। দাদুর উত্তর আসায় বাধাটা আর রইল না। খুব একটা গোলমেলে পথ নয়। হাওড়ায় গাড়িতে চেপে নামবে ময়নাডাঙ্গা স্টেশনে। ওখানে দাদুর লোক এসে ওদের নিয়ে যাবে। কেবল বুম্বার মা বলেছিলেন, 'তোমরা তিনজনেই তো বেশ শান্ত সুবোধ ছেলে। হুজুগের মাথায় কোথায় কখন কী করে বসবে, এই আমার দুশ্চিন্তা। অযথা কোন ঝামেলার মধ্যে মাথা 'গলাবে না। পৌঁছেই বাড়িতে চিঠি লিখবে।'

তিনজনেই সুবোধ বালকের মতো 'হ্যাঁ' বলে আর সেখানে দাঁড়ায়নি। কে জানে আবার কোত্থেকে কে কখন বাধা দিয়ে বসবে! শেষ পর্যন্ত তাতনদের বাড়ির পুরনো চাকর রুইদাস ওদের স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেছে।

রবিবারের সকাল। ভিড়টা ওরা ভেবেছিল কমই হবে। কিন্তু এ যেন অন্য দিনের তুলনায় অনেক বেশি। সব কামরায় লোক উপ্‌চে পড়ছে। এত ভিড় দেখে তিনজনেই কেমন যেন দমে গেল। ট্রেন ছাড়তে তখনও প্রায় পনরো-যোলো মিনিট বাকি। কিন্তু কোনো কামরায় তিলধারণের স্থান নেই। অবশ্য তিনজনের সঙ্গে খুব একটা মালপত্তরও নেই। একটা করে সুটকেশ। এখন গরমকাল। জামাকাপড়ের বোঝা কম হলেও টুকিটাকিতে সুটকেশ ভারী হয়ে গেছে। তারপর একজনের কাঁধে ক্যামেরা। একজনের কাঁধে ওয়াটার বট্‌ল। আর একজনের কাঁধে দূরবীন। দূরবীন আর ওয়াটার বট্‌ল্ যে কোন্ কম্মে লাগবে সেটা বুম্বার মাথায় আসছিল না। ওতো ভিড়টিড় দেখে বলেই বসল, এই বোঝাগুলো কেন নিয়েছিস বুঝি না, আমরা কী এক্‌স্‌পিডিশানে যাচ্ছি? যতঃসব।
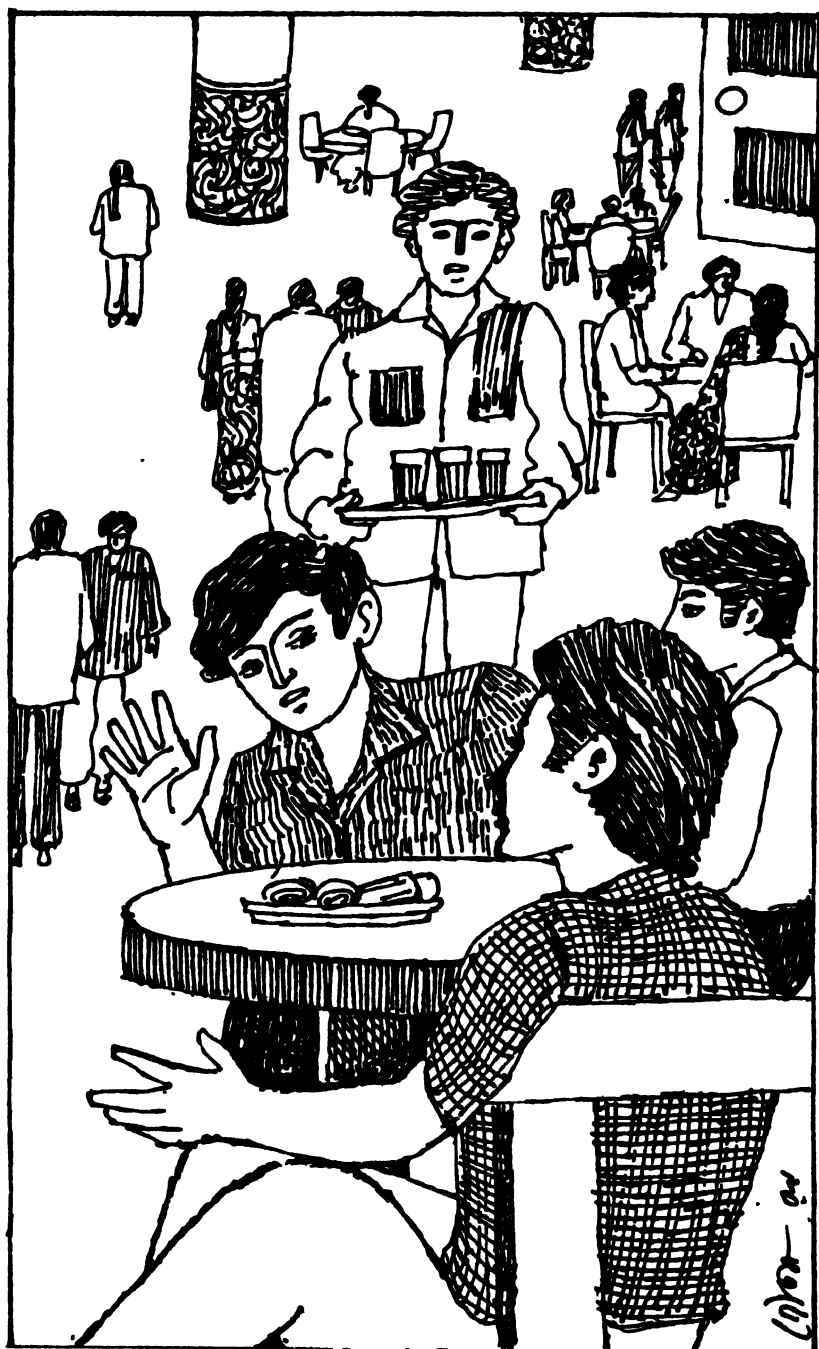
ভিড় দেখে তাতন আর শুভ্রও খানিকটা চিন্তায় পড়ে গেল। গজগজ করতে করতে অপেক্ষাকৃত কম ভিড় দেখে একটা কামরায় ঠেলে উঠতে যাচ্ছিল বুম্বা। হঠাৎ তাতন হাত বাড়িয়ে ওর সুটকেশ টেনে ধরল, 'যাচ্ছিস কোথায়?'

'ময়নাডাঙ্গায়।'

'মানে, ঐ ভিড়ে উঠবি?'

'তা তাতনবাবু, ময়নাডাঙ্গা যেতে গেলে তোমায় এই ট্রেনই ধরতে হবে। এবং এই ট্রেনে যেতে গেলে এইভাবেই উঠতে হবে। দেখি ক্যারাটেটা এখানে কাজে লাগে কিনা!'

'না, এভাবে যাওয়া যায় না।' বাধা দেয় তাতন, 'ট্রেন ছাড়তে আর ক'মিনিট বাকি আছে রে শুভ্র?'

শুভ্র ওর নতুন ইলেকট্রনিক্স্ ওয়াচ দেখে বলল, 'বারো মিনিট সাতচল্লিশ সেকেন্ড।'

'ওকে., এই নে।' বলে পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে শুভ্রর হাতে দিয়ে বলল, 'কথাটা নীল কাকু আমাকে শিখিয়েছে। ট্রেনে করে কোথাও গেলে আরামে যাবি। ফার্স্ট ক্লাশে উঠবি। বসবি জানলার ধারে। চিন্তা করার মতো এত ভাল জায়গা আর নেই। বুঝলি কিছু?'

'তার মানে', বুম্বা বলল, 'ফালতু কিছু পয়সা নষ্ট।'

'তা হোক। যা—আর সময় নেই। টিকিটটা তাড়াতাড়ি চেঞ্জ করে আন। ফার্স্ট ক্লাস ফাঁকা। আমরা ততক্ষণে গুছিয়ে বসছি।'

শুভ্র চলে গেল। তাতন আর বুম্বা গিয়ে উঠল একটা প্রায় নির্জন প্রথম শ্রেণীর কামরায়। মিনিট পাঁচেক পরেই একজন অবাঙালি সেই কামরায় উঠলেন। মাথায় বেনারসি টুপি। সাদা গলাবন্ধ কোট। মালকোঁচা করে পরা ফিনফিনে ধুতি। পায়ে মোজা ছাড়া কালো নাগরা। হাতে মাঝারি মাপের ভি. আই. পি. ব্যাগ। চোখে সোনালি ফ্রেমের রোদ-চশমা। ভদ্রলোক ওদেরকে গ্রাহ্য না করে কামরার অন্য ধারে জানলার কাছে গিয়ে বসলেন। 'ওঃ, কেইসা গরম!' বলেই কোটটা খুলে ফেললেন। টেরিকটের পাঞ্জাবির হাতা গোটালেন। হাতের স্টেটস্‌ম্যানটা দিয়ে হাওয়া খেতে শুরু করলেন। ফিসফিস করে একবার বুম্বা বলল, 'হ্যাঁ রে, এই গরমে, কী সব চাপিয়েছে?'

'শীতকালেই না বাবুআনা। বেচারি বোধহয় বুঝতেই পারেনি এখন গরমকাল—বলেই তাতন জানলার বাইরে মুখ ফেরাল।

গাড়ি ছাড়ার দেড় মিনিট আগে শুভ্র এসে গেল। রেল কোম্পানীর কী মতি

হয়েছে কে জানে, ঠিক ন'টা বেজে তেতাল্লিশ মিনিটেই গাড়ি হাওড়া স্টেশন ছেড়ে চলতে শুরু করল।

'নে শুভ্র, এবার আরম্ভ কর।'

'কী?'

'তোর চৌধুরীবাড়ির কালীঠাকুরের ইতিহাস।'

'এক্স্‌কিউজ মী,' বলেই বুম্বা হাত তুলল, 'আই অ্যাভ্‌ ওয়ান কোয়েশ্চেন, বিফোর ইউ স্টার্ট ইউর স্টোরি—'

'বেশ, বল্‌।'

'তোর দাদুর নাম কী?'

'রাঘবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। সংক্ষেপে রানা চৌধুরী।'

'যদিও প্রশ্নটা করা ঠিক হচ্ছে না, তবু আউট অব কিউরিসিটি, তোর দাদু— মানে, মায়ের বাবা তো?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়।'

'তাহলে তোরও সারনেম চৌধুরী, তোর দাদুরও—

হো হো করে হেসে উঠল শুভ্র। তারপর বলল, 'দুর বোকা, চৌধুরী তো আমাদের উপাধি। আমার বাবারাও পৈতৃক সূত্রে চৌধুরী খেতাবের মালিক, দাদুরাও তাই। এসব ইংরেজ আমলের করুণা। আমাদের আসল পদবি বোস আর দাদুদের হচ্ছে ঘোষ।'

'নাউ ইট ইজ ক্লীয়ার। স্টার্ট ইওর হিস্ট্রি।'

তাতন কিন্তু এতক্ষণ কোনো প্রশ্নই করেনি। সে নিবিষ্টচিত্তে অন্যদিকে বসা সেই ভদ্রলোকটিকে দেখে যাচ্ছিল। হঠাৎ ও কেমন যেন বিড়বিড় করে উঠল, 'এটা কেমন করে হয়?'

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শুভ্র ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিছু বলছিস?'

'লোকটাকে দেখ্‌।'

শুভ্র আর বুম্বা দু'জনেই লোকটির দিকে তাকালো। খুব একটা দর্শনীয় দেখতে নন ভদ্রলোক। ভাঙা গাল। ঠোঁটে পানের ছোপ। রোগা চেহারা। তরিবত-করা গোঁফ। ভদ্রলোক তখন ঢুলছেন।

এমন চেহারার বহু লোককেই সারা ভারতবর্ষে দেখতে পাওয়া যায়। শুভ্র বা বুম্বা কেউই কোনো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য খুঁজে না পেয়ে তাতনকে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'খুব কমন্‌ ফিগার। অত দেখার কী আছে?'

'নেই বলছিস? আচ্ছা শুভ্র, তুই তো কাউকে একবার দেখলে আর ভুলিস

না। একে এর আগে কোথাও দেখেছিস।'

'না।'

'দেখিসনি—না? আচ্ছা, লোকটা কী সত্যিই অবাঙালি?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

প্রায় ফিসফিস করে তাতন বলল, 'লোকটার ডান হাতটা দেখ্।'

শুভ্র ভাল করে দেখে বলল, 'একটা উল্কি আছে।'

কী লেখা আছে—পড়তে পারছিস?'

'আরে তাইতো! বাংলায় একটা অক্ষর লেখা—'র'।'

'লোকটা যদি অবাঙালি হবে তাহলে ওর হাতে বাংলায় অক্ষর লেখা থাকবে কেন?'

'ব্যস, আরম্ভ হ'ল গোয়েন্দাগিরি,' রীতিমতো বিরক্ত হয়ে বুম্বা বলল, 'কার হাতে কী লেখা আছে, এখন তাই নিয়ে আরম্ভ হ'ল তোদের ইনভেস্টিগেশন। হ্যাঁ রে শুভ্র, এই তোর ইতিহাস? তুই শুরু করবি না কি আমি ট্রেনে ক্যারাটে প্র্যাকটিস করব?'

অগত্যা গোয়েন্দাগিরি ত্যাগ করে শুভ্র ওর গল্প শুরু করল, 'সমস্ত গল্পটাই আমার মার কাছে শোনা। এটা বলতে পারিস, আমার মাতুল পরিবারের ইতিহাস। প্রায় কিংবদন্তীর মতো। কিংবদন্তী মানে জানিস তো?'

আবার বুম্বা বিরক্ত। প্রায় খেঁকিয়ে উঠে বলল, 'স্কুলের মাস্টারের মতো তোকে কথায়-কথায় মানে বোঝাতে হবে না। কিংবদন্তী মানে জনশ্রুতি, এটা সবাই জানে। তুই বলে যা।'

শুভ্র আবার নিজের কথায় ফিরে এল, '১৭৭৯ সাল। মানে, আজ থেকে ঠিক দুশো কুড়ি বছর আগের কথা। সে-বার পয়লা অক্টোবর পড়ে বিজয়া দশমী। ওদিকে আবার মুসলমানদের মহরমও পড়ে ঐ একই দিনে। হিন্দুদের বিজয়ার শোভাযাত্রা আর মুসলমানদের তাজিয়া। কিন্তু কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল, লেগে গেল দাঙ্গা। ওরা তছনছ করে দিল হিন্দুদের উৎসব। এরা ভাঙল তাজিয়া, চুরমার করল মসজিদ। মধ্যিখান থেকে মারা পড়ল কিছু নিরীহ হিন্দু আর মুসলমান।

'কিন্তু ঘটনাটা এখানেই শেষ হ'ল না। একটা জায়গা থেকে শুরু হয়ে শেষ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল অনেক দূর। ময়নাডাঙ্গাতেও তার জের এসে পড়ল। এখানে হিন্দুদের সংখ্যা বেশি হলেও মুসলমানরাও কিছু কম ছিল না। সুযোগ পেলেই যে যাকে পায় ঘ্যাঁচাং। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন চরমে উঠল যে, লক্ষ্মীপুজো গিয়ে কালীপুজো এসে গেল, কিন্তু দাঙ্গা আর থামতে চায় না।

'অথচ কালীপুজো হিন্দুদের কাছে একটা বিরাট ফেস্টিভ্যাল। বিশেষ করে, ময়নাডাঙ্গার চৌধুরী বাড়িতে। অ্যাকচুয়ালি চৌধুরীবাড়িতে যে ঠিক কবে থেকে কালীপুজো শুরু হয়েছে তা জানা নেই। কিন্তু প্রতিবছর পুজোটা হ'তই। দাঙ্গা তখন এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত কালীপুজো হবে কিনা তাই নিয়ে তখনকার জমিদার সোমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত সোমেন্দ্রনারায়ণ প্রমুখ হিন্দু সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ইংরেজ সরকারের কাছে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা থামানোর জন্যে করলেন দরবার। দাঙ্গার ব্যাপারটা ইংরেজ সরকারেরও নজরে এসেছিল, তাই তারাও আর বসে না থেকে গোরা সৈন্য নামিয়ে দিল সারা দেশের বুকে।

'কিছুদিনের মধ্যেই দাঙ্গা থামল। কিন্তু সমস্ত অবস্থাটা পুরোপুরি শান্ত হতে কেটে গেল আরো এক মাস।'

'কিন্তু', বলে বুম্বা আবার কথার মধ্যে কথা ঢোকাল, 'কালীপুজো? তার কী হ'ল?'

'হ্যাঁ, তাই বলছি। আর সেটাই হচ্ছে চৌধুরীবাড়ির মহাকালীর আসল ইতিহাস। দাঙ্গার হিড়িকে সে-বার আর কালীপুজো তেমন জমল না। নমো-নমো করে এদিকওদিক কোনো রকমে নিয়ম রক্ষার পুজো হলো। বিঘ্নঘটার জন্যে সোমেন্দ্রনারায়ণ সে-বারের মতো আর পুজোই করলেন না। কিন্তু—'

শুভ্র হঠাৎ ওর গল্প থামিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখল, মৌরি ক্রস করছে। খানিকক্ষণ পর তাতন বলল, 'শুভ্র, একটা ইন্‌টারেস্টিং জায়গায় এসে দুম্‌ করে থেমে যাস না। তারপর কী হ'ল বল্‌।'

'বলছি। আচ্ছা, তোরা স্বপ্নাদেশ বা দৈবাদেশ বলে কিছু বিশ্বাস করিস?'

তাতন চট্‌ করে কোনো কথায় মন্তব্য করে না। কিন্তু বুম্বা মুখ-আল্‌গা ছেলে। ও-ই বলে উঠল, 'কাউকে-কাউকে বলতে শুনেছি, স্বপ্নে নাকি মাদুলি পেয়েছে। কোনোদিন অবশ্য নিজে কোনো দেব-দেবীর দর্শন পর্যন্ত পাইনি ভাই। মাদুলি তো দূরের কথা। তুই বলে যা। গল্পের খাতিরে আমরা এখন বিশ্বাস করছি।'

'বিশ্বাস ঠিক আমিও করিনি। এখনও তেমন করি না। কিন্তু সোমেন্দ্রনারায়ণ থেকে রাঘবেন্দ্রনারায়ণ, প্রায় ছ'সাত পুরুষ স্বপ্নাদেশ বিশ্বাস করেন। দাঙ্গা-টাঙ্গা থেমে গেছে। দেশে শান্তি ফিরে এসেছে। ঠিক এমনি সময়, বোধহয় চৈত্র মাসের গোড়ার দিকে, একদিন স্বপ্নাদেশ হ'ল। সোমেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী অঘোরময়ী দেবী এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। স্বয়ং মা কালী এসে মাথার শিয়রে দাঁড়িয়েছেন।

টকটকে লাল চোখে ভর্ৎসনা আর ক্রোধ। প্রচন্ড রেগেটেগে গিয়ে তিনি অঘোরময়ীকে বলছিলেন, 'সারা বছরে একবারের জন্য তোদের বাড়িতে আমি আসি। তাও তোরা বন্ধ করে দিলি? যদি নির্বংশ হতে না চাস, তা হলে গ্রামের শেষপ্রান্তে শ্মশানের ধারে বিরাট বটগাছের নিচে একটা কালো পাথরের ছদ্মবেশে আমি পড়ে আছি। সেই পাথর নিয়ে এসে আমার মূর্তি গড়বি। আর সামনের বৈশাখ মাসের ঘোর অমাবস্যার রাতে নিরম্বু উপবাস করে আমার পুজো করবি। নইলে চৌধুরীবংশ ধ্বংস হয়ে যাবে।' বলেই দেবীমূর্তি অদৃশ্য হয়ে যান।

'বাপরে, কী ডেঞ্জারাস!' বলেই চিরকেলে নাস্তিক বুম্বা বেঞ্চের ওপর পা তুলে হাঁটু মুড়ে বসতে বসতে বলল, 'এ যে রূপকথার গল্প রে! তা সত্যিই সেই কালো পাথর পাওয়া গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ। শুধু পাওয়া নয়, আরো একটা অলৌকিক কাণ্ড ঘটেছিল। স্বপ্নাদেশের কথা শোনামাত্রই সোমেন্দ্রনারায়ণ নিজে সেই বটগাছের নিচে গিয়ে পাথরটা আবিষ্কার করেন। ব্যাপারটা সত্যিই আশ্চর্যের। কারণ, এর আগে কেউ কোনোদিনও বটগাছের নিচে ওরকম পাথর পড়ে থাকতে দেখেনি।'

এবার তাতন জিজ্ঞাসা করল, 'পাথরটার সাইজ কী রকম ছিল?'

'নিশ্চয় বেশ বড়সড় ছিল। কারণ, সেই পাথর কেটে চৌধুরীবাড়ির যে প্রতিমা তৈরি হয়েছে তা কম করেও তিন ফুট লম্বা তো হবেই। এটা অবশ্য আমার শোনা কথা।

'কিন্তু তুই কী যেন অলৌকিক কাণ্ড বলছিলি?'

'হ্যাঁ, গল্পটা যদি সত্যি হয় তাহলে বলতে বাধা নেই, সেটা একটা অলৌকিক ঘটনা। জয়পুর থেকে তখনকার দিনের একজন সেরা পাথর-কাটিয়েকে দিয়ে যখন প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু হ'ল, ন্যাচারালি পাথর কাটতেই হবে, সেই পাথর কাটতে গিয়ে দেখা গেল অদ্ভুত নীল পাথরের একটা মুণ্ড বেরিয়ে এল।'

'মুণ্ডু মানে মাথা?' বুম্বার চোখে বেশ বিস্ময়।

'হ্যাঁ, মাথা। মা কালীর গলায় আর হাতে যে অসুরদের কাটা মাথা থাকে ঠিক সেই রকম। অপূর্ব কাজকরা সেই মুণ্ড। দেখলেই মনে হবে, কোনো সেরা শিল্পী নিপুণ দক্ষতায় মুণ্ডুটা বানিয়ে পাথরের মধ্যে লুকিয়ে রেখে গেছে।'

তাতন বলল, 'ভারি ইন্টারেস্টিং তো!'

'আরো আছে, ছেনি দিয়ে কেটে কেটে যখন কালীমূর্তি তৈরি হচ্ছে সেই পাথরের চাঁই থেকে আরো ওই রকম কয়েকটা মুণ্ডু বেরিয়ে আসে।'

বুম্বা বলল, 'আলাদীন না পি. সি. সরকার—কিছুই মাথায় ঢুকছে না।'

'আমারও ঢোকেনি। তবে এটাই প্রবাদ। তারপর দেখতে দেখতে সারা গাঁয়ের বুকে ছড়িয়ে গেল কথাটা।'

'আচ্ছা', বলে তাতন আর একবার শুভ্রকে বাধা দিল, 'সব মাথাগুলোই কী নীল রঙের?'

'না রে। কোনোটা গাঢ় সবুজ, কোনোটা সাদা, কোনোটা টকটকে লাল, কোনোটা হলদে, কোনোটা বেগুনি, কোনোটা বা ডীপ অরেঞ্জ।'

'তা সেই মুণ্ডুগুলো কী হ'ল শেষ পর্যন্ত?' এবার বুম্বার প্রশ্ন।

'সেইগুলো দিয়েই তো দেবীর গলার রত্নহার তৈরি হয়েছে। সব থেকে মজার কী জানিস, মুণ্ডুগুলো বোধহয় খুব দামি পাথরের। ঘোর অমাবস্যার রাতে দেবীর যেদিন পুজো হয়, সেই ঘরে তেমন কোনো আলো জ্বলে না। সামান্য প্রদীপের আলো মাত্র। তাতেই মুণ্ডুগুলো থেকে লাল নীল সবুজ হলুদ নানান রকমের আলো ছিটকে বেরিয়ে মন্দিরের মধ্যে একটা রামধনু-এফেক্টে আলো তৈরি হয়। আর সেই আলোতেই দেবীর পুজো হয়। সত্যিই দেখার মতো জিনিস। না দেখলে তোদের বিশ্বাসই হবে না।'

'আহ্ সঙ্গে যদি এখন নীল কাকু থাকত', তাতন একটু আফসোসের ভঙ্গীতে বলল, 'এমন একটা জিনিস, না দেখলে সত্যি ক্ষোভ থেকে যেত। দৈবই হোক আর যাই হোক, অন্তত দুষ্প্রাপ্য কিছু পাথর তো দেখা যাবে।'

'কিন্তু,' বলে বুম্বা আবার প্রশ্ন তুলল, 'তুই নিজের চোখে এসব দেখেছিস, না, কেবল গপ্পোই শুনেছিস?'

'না, আমি কোনোদিনও দেখিনি। খুব ছেলেবেলায় একবার মার সঙ্গে গিয়েছিলাম কালীপুজোর দিন। তা তখন আমি এত ছোট ছিলাম যে, আমার কিছু মনেই পড়ে না। সত্যি কথা বলতে কী, জ্ঞান হবার পর আমি কোনোদিনও আমার দাদুকে চোখেই দেখিনি।'

'সে কী রে! দাদুকে চোখে দেখিসনি! তাহলে তোর দাদু তোকে চিনবেন কী করে?'

'আহা, দাদুকে আমার মনে নেই ঠিক কথা, তাব'লে কী আমাদের বাড়িতে দাদুর কোনো ছবিও নেই? আর সঙ্গে তো দাদুর লেখা চিঠি রয়েছে,' বলে শুভ্র পকেট থেকে ইনল্যান্ড খামখানা বার করে দেখালো।

কি জানি কী মনে করে তাতন ওর হাত থেকে চিঠিটা নিল। একবার উল্টেপাল্টে দেখল, তারপর ফেরৎ দিতে দিতে বলল, 'দেখিস বাবা, আবার যেন অযথা ঘুরে না আসতে হয়।'

'কী যে বলিস', বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়েই শুভ্র বলল, 'আমাদের তিনজনকে পেলে দাদুর খুব আনন্দ হবে। কতোদিন তো মাকে চিঠিতে লিখেছেন, নিজেরা তো আসা ছেড়েই দিয়েছিস, দাদুভাইকেও কী এক-আধবার পাঠাতে পারিস না?'

একটু থেমে শুভ্র আবার বলল, 'আসলে কী জানিস, মানুষ বুড়ো হলে বোধ হয় সঙ্গী চায়। কেউ তাঁর পাশে বসে দু'দণ্ড গল্প করুক, এমন ইচ্ছে বোধ হয় সব বুড়োমানুষেরই হয়।'

এর পর শুভ্র আর কিছু না বলে জানালার বাইরে তাকিয়ে রইল। গাড়ি তখন ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। তাতনের কিন্তু দৃষ্টি একইভাবে পড়ে রয়েছে সেই অবাঙালি ভদ্রলোকটির দিকে। ভদ্রলোক বোধ হয় গত রাত্রে ঘুমোননি। এখনও ঢুলছেন। দেখতে দেখতে ময়নাডাঙ্গা এসে গেল। ছোট্ট স্টেশন। এক মিনিটের মতো দাঁড়ায়। ওরা তিনজনেই ঝুপঝুপ করে নেমে পড়ল।

ট্রেন স্টেশন ছেড়ে চলে গেছে। হঠাৎ বুম্বা স্কিপিং করার মতো দু'বার লাফিয়ে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ রে, তোর দাদুর কোনো পুকুরটুকুর নেই?'

'হ্যাঁ, আছে। কিন্তু আসার সময় মা পই-পই করে বারণ করে দিয়েছেন পুকুরে নামতে। তাছাড়া মজা পুকুরে সাঁতারের অভ্যেস নেই আমাদের। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। ম্যালেরিয়া..'

'দোহাই শুভ্র,' বুম্বা ওকে বাধা দিল, 'দয়া করে তুই এখানে এসে আর বাবা-কাকাদের মতো জ্ঞান দিস না। আমি এখানে আমার নিজের খুশিমতো থাকব।' বলেই, ও কয়েক পা এগিয়ে হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, 'আর একটা কথা শোন, তোদের যত ইচ্ছে হয় দাদুর সঙ্গে গল্প করে ওনার নিঃসঙ্গতা দূর করিস। আমি কিন্তু বুড়োদের একদম টলারেট করতে পারি না।'

'আঃ বুম্বা', তাতনের গলায় বেশ ধমক, 'ডোন্ট ফরগেট হি ইজ আ রেসপেকটেব্‌ল পার্সন অ্যান্ড গ্র্যান্ডফাদার অব শুভ্র। বৃদ্ধদের টলারেট করতে না পারো থেকো না, কিন্তু তাঁদের রেসপেক্ট করা আমাদের ডিউটি।'

'খোঁকাবাবু ঠিক বাত্‌ই বলিয়েছেন।'

হঠাৎ ভূত দেখার মতো ওরা তিনজনেই চমকে উঠল। এমন কী, যে তাতনের সচরাচর কোনো ব্যাপারেই দৃষ্টি এড়ায় না, সেও কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে পিছন ফিরে তাকাল।

ট্রেনের সেই অবাঙালি ভদ্রলোক কখন যেন ট্রেন থেকে নেমে পড়েছেন। আর ঠিক ওদের পিছনে এসেই দাঁড়িয়েছেন।

বুম্বা বরাবরই রগচটা। তার ওপর অপরিচিত কেউ যদি ওদের কথার মধ্যে

ইনটারফেয়ার করে সেটা ও কোনোমতেই সহ্য করতে পারে না। মুখে যা আসে দুমদাম বলে দেয়। বেশ রাগত স্বরে ও ভদ্রলোকের উদ্দেশে বলল, 'আপনার কী দরকার মশাই, আমাদের কথার মধ্যে নাক গলাবার?'

ভদ্রলোক পানের ছোপধরা দাঁত বার করে খ্যাক খ্যাক করে হাসলেন। তারপর আগের মতোই ভাঙা বাংলায় বললেন, 'ঝুটমুট গোঁসা করছেন কেনো খোঁকাবাবু? সাচ্ বাত্ শুনলে আচ্ছা লাগে। এখোন তো সাচ্ বাত্ কোই আদমি বোলে না। হামি হাপনাদের তারিফ করছিলাম।'

'আর তারিফ করতে হবে না। এবার আপনি কাটুন।' বুম্বার রাগ তখনও যায়নি।

'ঠিক আছে', বলে ভদ্রলোক স্টেশন ছেড়ে যখন এগিয়ে যাচ্ছেন, তখন হঠাৎই তাতন ওঁকে ডেকে বসল, 'শুনুন।'

'হামাকে বললেন?'

'হ্যাঁ। আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে—'

'কেইসে দেখবেন? হামি তো দু'চার রোজ হ'ল রাজস্থানসে কলকেত্তা এলাম।'

'রাজস্থান থেকে এলেন? এই প্রথম নাকি?'

'নেহি, আউর দু'চার দফে এসেছে।'

'আশ্চর্য। তা এখানে যাবেন কোথায়?'

'হামার এক জানপয়ছান দেশোয়ালি আদমি ইখানে আছেন তো—'

ভদ্রলোক বোধ হয় আর দাঁড়াতে চাইলেন না। তাড়াতাড়ি এগোতে গিয়ে ওর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা শুভ্রর সঙ্গে ধাক্কা খেলেন। ক্ষমা-টমা চেয়ে নিয়ে হন্‌হন্ করে প্ল্যাটফরমের সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন।

'নে—চ। যত সব ঝুট ঝামেলা।' বলে বুম্বাও এগোতে চাইল। শুভ্রর ততক্ষণে ভ্রূ কুঁচকে গেছে। সে হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'স্টেশনে দাদু লোক পাঠাবেন বলেছিলেন, কিন্তু—'

'তোরও যেমন বুদ্ধি,' বুম্বা বিজ্ঞের মতো বলল, 'লোক যদি এসেও থাকে, তোকে চিনবে কী করে?'

শুভ্র বলল, 'আমার গায়ে এখন কী রঙের জামা আছে?'

'লাল।'

'এই দেখ্ দাদুর চিঠি, তিনি স্পষ্টই লিখেছেন, তোমাদের যদি কারো লাল রঙের জামা থাকে তাহলে সেটা পরে থেকো, গণেশ হালদার তোমাদের ঠিক খুঁজে নেবে। অথচ দেখ্, কারো পাত্তা নেই।'

'দেখ্, আমার পেটে এখন ছুঁচোয় ডন দিচ্ছে। তোর দাদু এখানকার নামকরা লোক। অতএব রিক্সা নিলেই ঠিক বাড়ি পৌঁছে যাব। চ এখন। তোর আবার কী হ'ল?' বলে বুম্বা তাতনের দিকে ফিরল।

তাতন ভ্রূ কুঁচকে পাথরের স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে বলল, 'রাজস্থান থেকে সবে এসেছে। পায়ে রাজস্থানী নাগরা থাকা উচিত ছিল। কিন্তু আছে খাস কোলকাত্তাই 'বাবু-লপেটা'। হাতে বাংলায় লেখা—'র'। কলকাতায় বারদুয়েক এসেই ভাঙা বাংলা বলতে আটকায় না—আরে, ওটা কী?' বলেই ও শুভ্রর সামনে পড়ে থাকা খবরের কাগজটা তুলে নিল।

'আরে এই কাগজটা দিয়েই তো লোকটা ট্রেনে হাওয়া খাচ্ছিল। এরা যে কেন কাগজ কেনে,' বলে বুম্বা সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

ততক্ষণে কাগজটার এক জায়গায় তাতনের দৃষ্টি আটকে গেছে। ধীরে ধীরে সে কাগজটা শুভ্রর দিকে এগিয়ে দিল।

স্পষ্ট এবং পরিষ্কার বাংলায় লেখা, বুঝতে শুভ্রর কোনো অসুবিধা ছিল না—তবু সে হয়ত বুম্বাকে শোনানোর জন্যেই পড়ল, 'ছেলেরা, সব কিছু কোরো কিন্তু চোখ আর কান খুলে। মনে হচ্ছে, সামনে বড় রহস্য। ইতি—তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী।'

শুভ্রর চোখে-মুখে গভীর বিস্ময়। ডানপিটে বুম্বাও কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। তাতন নির্বিকার। কিন্তু তার ভ্রূ আর চোখে ভাবনার মেঘ জমেছে।

শুভ্র বলল, 'অমন গুম মেরে গেলি কেন?'

তাতন গম্ভীর মুখেই বলল, 'বড় চেনা-চেনা মুখ। কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছি না—কোথায় যেন দেখেছি।'

'কী আবোল-তাবোল বকছিস?'

'আবোল-তাবোল? তা হবে। নে চ, সত্যিই খিদেটা বেশ চনমন করে উঠেছে।'

তিনজনেই এগিয়ে গেল প্ল্যাটফর্মের সিঁড়ির দিকে।

॥ তিন ॥

ঘড়ির কাঁটা দুটো যখন বারোটার ঘরে এসে এক হয়ে গেছে ওদের গাড়ি তখন এসে থামল রাঘবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর প্রায় জরাজীর্ণ সাবেকি বাড়িটার সামনে। দেখলেই মনে হয় বহুদিন কোনো সংস্কার করা হয়নি। অনেক জায়গায় পলেস্তারা খসে পড়েছে। স্থানে স্থানে ছোট বড় বট-অশ্বত্থের ডালপালা উঁকি দিচ্ছে। বেশ কয়েক বিঘে গাছগাছালির ভিড়ের মধ্যে বাড়িটা অতীতের স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এককালে বাঁধানো পাঁচিল দিয়ে বাগানের সীমানা ছিল। এখন যা রয়েছে

তা কেবল নোনাধরা ইঁটের ধ্বংসাবশেষ। গেটের মুখে দু'পাশে দুটো বিরাট গম্বুজ। কিন্তু সেগুলোরও ভগ্নদশা। গম্বুজের ওপরে এককালে দুটো সিংহ মুখোমুখি বসানো ছিল। অনেকটা কলকাতার রাজভবনের মতো। রাজভবনে অবশ্য মাঝখানে সিংহ অন্য দুদিকে স্ফিংক্স। এখন সিংহ দুটোর কোনোটাই পুরো নেই। একটার সামনের আর পেছনের একটা করে পা খসে গিয়ে কেবল লোহার সিক দেখা যাচ্ছে; অন্যটার তো মুখটাই গেছে উড়ে।

তিনজনেই অবাক হয়ে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

তাতনের চোখে বিস্ময়। বুম্বা কিছুটা আশাহত। আর শুভ্র বেশ লজ্জিত। একটু পরে শুভ্র বলল, 'মার মুখে কিছুটা শুনেছিলাম, কিন্তু এত পুরনো বাড়ি আগে বুঝতে পারিনি। তাহলে হয়তো তোদের এভাবে—'

তাতন হঠাৎ হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'দারুণ! দারুণ!'

শুভ্র বলল, 'তার মানে?'

'ট্রেনে রহস্যময় অজানা সহযাত্রী। দুশো কুড়ি বছরের পুরনো স্বপ্নাদেশে পাওয়া কালীর রত্নহার। তার ওপর এই পুরনো ভাঙা জমিদারবাড়ি! আর এর সঙ্গে যদি একটা খুনের ব্যাপার থাকত—ওঃ, সোনায় সোহাগা! নিদেন পক্ষে, একটা চুরি—'

'তুই থাম তো,' বুম্বা ধমকালো তাতনকে, 'কোথায় এলুম এক জমিদারবাড়িতে ছুটি কাটাতে, কালীপুজো দেখতে, তা নয়, তুই এখন এর মধ্যে খুন চুরি ডাকাতি ঢুকিয়ে সমস্ত আনন্দটাই মাটি করতে চাইছিস?'

বুম্বার কথা শেষ হবার আগেই খয়েরি রঙ হাত কাটা পাঞ্জাবি আর ধুতি পরা একজন বছর পঞ্চাশের লোক লোহার গেট ঠেলে ওদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভাল করে ওদের দেখে বলল, 'মনে হচ্ছে তোমরা এখানে নতুন। তা কাকে খুঁজছ?'

শুভ্রই এগিয়ে গিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমরা কলকাতা থেকে আসছি। এটাই কী রানা চৌধুরীর বাড়ি?'

'হ্যাঁ।'

'আমরা তাঁর কাছেই এসেছি। আমি রাঘবেন্দ্র চৌধুরীর নাতি। আপনি কে?'

'আমি এ বাড়ির একজন কর্মচারী।'

'তার মানে, আপনি গণেশ হালদার?'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরেছ। আমি গণেশ হালদারই। কিন্তু আমাকে চিনলে কেমন করে?'

'দাদুর চিঠি থেকে। উনি লিখেছিলেন আপনিই আমাদের স্টেশন থেকে নিয়ে আসতে যাবেন। দাদু কী আপনাকে কিছু বলেননি?'

'কই, না তো! তবে কর্তাবাবুর বয়েস তো হয়েছে অনেক। তাই বলতে ভুলে গেছেন হয়তো।'

হঠাৎ তাতনের মুখ থেকে আবার বলতে শোনা গেল, 'স্ট্রেঞ্জ।'

'একথা কেন বলছ ভাই?'

'দাদু আমাদের আসতে চিঠি দিলেন। তিনি জানেন আমরা এখানে নতুন। এমনকি লাল জামা পরার কথাও উল্লেখ করতে ভুললেন না, অথচ আপনাকে বলতে ভুলে গেলেন? উনি কী খুব ভুলো মনের মানুষ?'

'না', বেশ দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়লেন গণেশ হালদার, 'কর্তাবাবুর স্মৃতিশক্তি খুবই প্রখর। বুঝতে পারছি না কেন তিনি এমন একটা জরুরি কথা বলতে ভুলে গেলেন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্যেও—'

'এই তো দেখুন না', বলে শুভ্র পকেট থেকে ইনল্যান্ড খামখানা বার করে গণেশ হালদারের সামনে মেলে ধরে বলল, 'দাদুর লেখা চিঠি। আমাদের আসতে বলেছিলেন।'

'না না, সেকি কথা! আমি কী আর তোমাদের অবিশ্বাস করছি? চল চল— ভেতরে চল।'

গণেশ হালদারের পেছনে পেছনে ওরা তিনজন গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল। আগেই বলেছি, জঙ্গল আর আগাছায় সমস্ত জায়গাটাই কেমন যেন বুনো হয়ে উঠেছে। সরু মেঠোপথ, মাঝে মাঝে ঘাস আর শ্যাওলা ডিঙিয়ে ওরা খোদ বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল। হঠাৎ তাতন শুভ্রর কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'দাদুর লেখা চিঠিটা দেখি।'

শুভ্র চিঠি বার করে তাতনের দিকে এগিয়ে দিল। বিনা বাক্যব্যয়ে তাতন সেটি পকেটে রেখে দিল। শুভ্র কিছু বলতে যাচ্ছিল। তাতন ইশারায় তাকে থামিয়ে দিল।

॥ চার ॥

বাইরে থেকে বাড়িটাকে যতটা জরাজীর্ণ মনে হয়েছিল, ভেতরে কিন্তু ততটা নয়। অন্তত খানিকটা ভদ্রস্থ। তবে সবখানেই একটা খাঁ খাঁ করা ভাব। একদিন বাড়িটা যে বিরাট ছিল তা বেশ বোঝা যায়। দু'মহলা থামওয়ালা বাড়ি। সামনেই ঠাকুরদালান। এককালে যাত্রা বা অন্য পুজোপার্বনে ঠাকুরদালান গম-গম করত।

এখন নিঃস্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অযত্নের ছাপ সর্বত্র। আসলে দেখাশুনার অভাব বেশ প্রকট। তবে সামনেই কালী পুজো। নিশ্চয় কিছু লোক সমাগম হবে। তাই সামান্য ঝাড়পোছের কাজ হয়েছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে। হঠাৎ তাতন প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা গণেশ দাদু, এ জায়গাটা বোধ হয় এখন আর ব্যবহার করা হয় না, তাই না?'

গণেশ হালদারের মতো একজন সাধারণ কর্মচারী তাতনের মুখে "দাদু" শুনে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যে। সামলে নিয়ে বলল, 'না ভাই কে আর ব্যবহার করবে? এ বাড়ির সব জাঁকজমকই তো গেছে। আছে কেবল ঐ মা কালীর পুজোটুকু। না করলে নয়, তাই আজও হয়। ঐ যতদিন কর্তাবাবু বেঁচে আছেন।'

'কিন্তু, আমি শুনেছি বড় দাদুর আর এক ভাই বেঁচে আছেন। তাঁরাও তো করতে পারেন।'

'তাঁরা কী করবেন জানি না। ছোট কর্তাবাবু তো নাস্তিক লোক। সে-সব অনেক কথা। শুনে কাজ নেই। আসলে কর্তাবাবুদের ভায়ে ভায়ে কোনো বনিবনা নেই।'

'কেন?'

'আমি সামান্য কর্মচারী', নিজেকে সামলে নিল গণেশ হালদার, 'এর বেশি কিছু আমাকে জিগ্যেস ক'রো না ভাই, বলতে পারব না।'

ওরা ততক্ষণে ঠাকুরদালান পেরিয়ে অন্দরমহলে পৌঁছেচে। তাতনই আবার প্রশ্ন করল, 'ঠাকুরদালানটা পরিষ্কার হয়েছে মনে হচ্ছে।'

'কলকাতা থেকে যাত্রাদল আসছে। পুজোর পরদিনই যাত্রা হবে এখানে।'

অন্দরমহলটা হঠাৎ যেন দু'ভাগ হয়ে গেছে। এতক্ষণ একটা শ্মশানের নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে ছিল। হঠাৎ ডানদিকের মহল থেকে মহিলা-কণ্ঠের আওয়াজ পাওয়া গেল। গণেশ হালদার ক্ষণিকের জন্য থেমে গেল।

'ওদ্দিকটা ছোট কর্তার অংশ।' তারপর শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার ছোট দিদিমার গলা।'

তাতন জিজ্ঞাসা করল 'বাড়িটা কী দু'ভাগ হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, ভাই। বাইরে থেকে বোঝা যাবে না। কিন্তু এ-মহল থেকে ও মহলে যাবার দরজাগুলো চিরদিনের মতো পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। ওঁদের অংশে যেতে গেলে তোমাদের বাড়ির বাইরে দিয়ে যেতে হবে।'

এর পর আর কোনো কথা হ'ল না। ওরা দোতলায় এসে দাঁড়াল। শ্বেতপাথরের মেজে। বারান্দায় সাবেকি রেলিং। পুরনো এবং জীর্ণ হলেও বারান্দাটা পরিষ্কার।
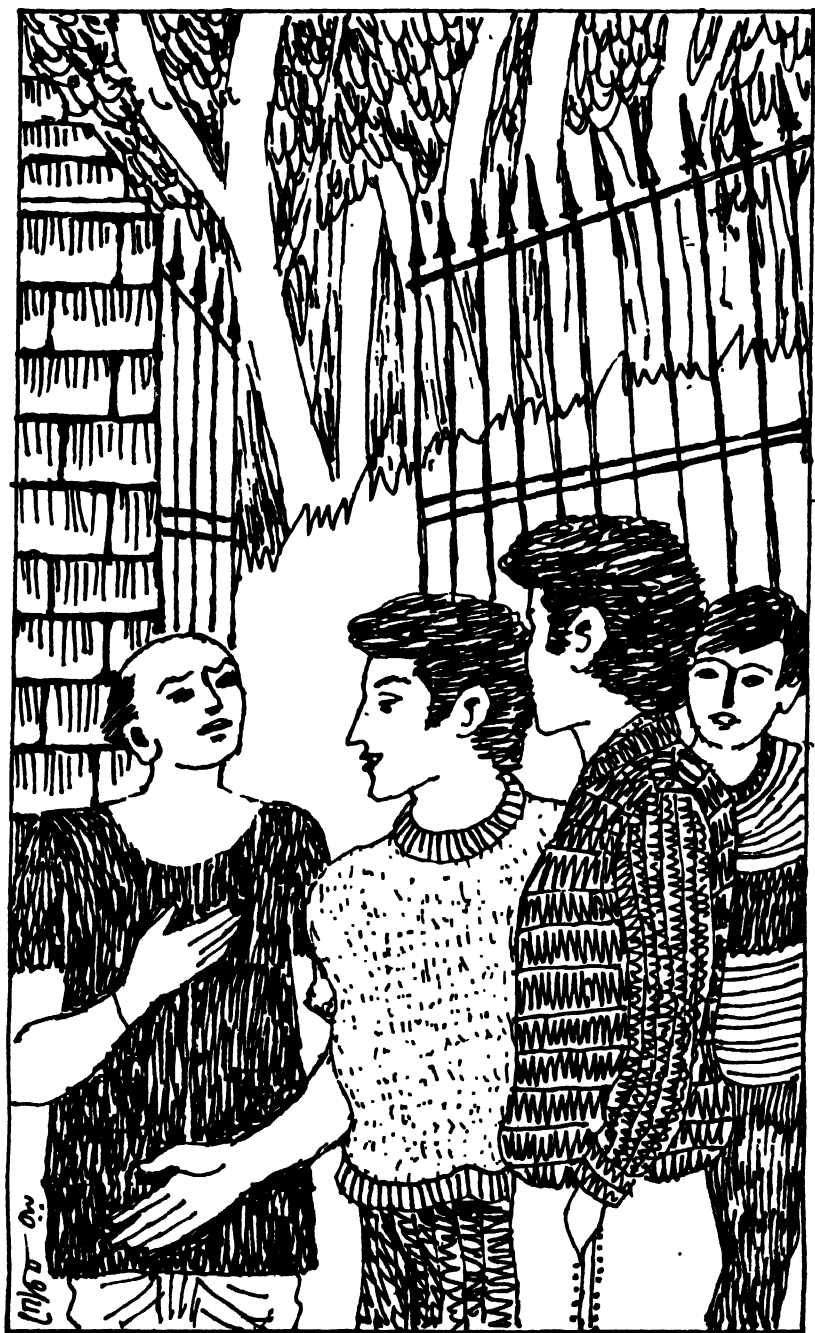
পর পর চারখানা বিরাট আকারের ঘর পার হয়ে একেবারে শেষাংশের ভেজানো ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল গণেশ হালদার। তারপর শুভ্রকে বলল, 'এটাই তোমার দাদুর ঘর। উনি ভেতরেই আছেন। তোমরা যাও। তবে বেশি কথা ব'লো না। ডাক্তারের বারণ।'

'কেন? কী হয়েছে ওঁর?' তাতনই প্রশ্নটা করল।

'একটা মাইল্ড স্ট্রোক। বিছানা ছেড়ে ওঠা বারণ। এবার যে পুজোর কী হবে!'

একটু চুপ করে থেকে তাতন বলল, 'আপনিও চলুন। আসলে দাদুর সঙ্গে তো আমাদের কোনোদিন চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি। তার ওপর উনি অসুস্থ।'

'বেশ, চল।' বলে গণেশ হালদার দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করে আস্তে আস্তে ডাকল, 'কর্তাবাবু, কর্তাবাবু—' অন্ধকারে ঘরের মধ্যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। প্রায় ফিসফিস করে গণেশ হালদার মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে কর্তাবাবু ঘুমচ্ছেন। এত বয়েস, শরীরও দুর্বল।'

ফস্ করে তাতন জিজ্ঞাসা করল, 'কতদিন অ্যাটাকটা হয়েছে?'

'তা আজ নিয়ে দশদিন।'

তাতনের মুখে হঠাৎ একটা বিস্ময় ফুটে উঠল। কিন্তু ও আর কোনো প্রশ্নই করল না।

এতক্ষণ বুম্বা একটাও কথা বলেনি। হঠাৎ ও বেজার মুখে বলে উঠল, 'এখানে কোনো ভাল হোটেলটোটেল নেই—না?'

'কেন? হোটেল কী হবে?'

'আমার পেটের মধ্যে একটা বাঘ অনেকক্ষণ থেকে হালুম-হালুম করছে।'

গণেশ হালদার হেসে ফেলল। তারপর বলল, 'চৌধুরীদের আজ আর সেদিন না থাকলেও, অতিথিকে দু'মুঠো অন্ন দেবার সংস্থান নিশ্চয় আছে। তোমরা একটু অপেক্ষা কর। আমি পাশের ঘর খুলে দিচ্ছি। আধ ঘন্টার মধ্যেই সব হয়ে যাবে।'

হঠাৎ অন্ধকার ঘরের মধ্যে থেকে আওয়াজ ভেসে এল, 'কে কথা বলে ওখানে?'

রীতিমতো গম্ভীর আর ভারী গলা। গণেশ হালদার দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল।

বাইরে থেকে শোনা গেল, গণেশ হালদার বলছে, 'কলকাতা থেকে আপনার নাতি এসছেন।'

'নাতি? কলকাতা থেকে? কেন?'

'আপনিই নাকি চিঠি দিয়েছিলেন, আসার জন্যে?'

'আমি?' তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে, 'ও—হ্যাঁ—তাইত। তা বাইরে কেন? ডাক।'

শুভ্র আর তাতন ভেতরে চলে গেল। বুম্বা গেল না। ও বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছোটকর্তার মহলে দাঁড়ে-বসা কাকাতুয়াটাকে দেখে ওর খিদে ভুলতে চাইছিল বোধ হয়।

একটা হালকা টিমটিমে বাল্ব জ্বলছে ঘরের মধ্যে। সহসা ঘরে ঢুকলে কাউকেই নজরে পড়ে না। অন্ধকারটা সয়ে গেলে তাতন দেখল, বিরাট একটা পালঙ্কের ওপর বুক পর্যন্ত মুড়ি দিয়ে এক বৃদ্ধ শুয়ে আছেন—মাথার নিচে ঢাউস তাকিয়া।

'বোসো। দাঁড়িয়ে রইলে কেন?' আবার সেই গম্ভীর আওয়াজ। স্বরটা গম্ভীর হলেও ভাঙা-ভাঙা। না বসে শুভ্র এগিয়ে গেল প্রণাম করতে। বৃদ্ধ হাত তুলে বললেন, 'ঠিক আছে, শোয়া মানুষকে প্রণাম করতে নেই। আমি তো একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। স্মরণশক্তিটা একেবারেই গেছে। তার ওপর আবার এই শারীরিক দুর্ভোগ। গণেশ, ওদের খাবার-টাবারের—'

বিনা বাক্যব্যয়ে গণেশ হালদার বেরিয়ে গেল।

'তবু ভাল, তোমরা এসেছ। আজকাল তো আর কেউ আসে না। তিন ছেলে, তিনটেই দূরে। বুড়ো বাপের সম্বন্ধে তাদের আর কোনো কৌতূহল নেই। থাকবে কেন? এ বুড়োর আর পয়সার জোর নেই। আর মেয়েরা তো বিয়ে দিলেই পর হয়ে যায়। তোমাদের মধ্যে আমার নাতি কোন্‌টি?'

শুভ্র এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আমিই আপনার ছোট মেয়ের ছেলে।'

'প্রতিমার ছেলে? বেশ বড়-সড় হয়ে গেছ। আর এটি?'

'আমার বন্ধু তাতন। ওর ভাল নাম বাপ্পাদিত্য সেনগুপ্ত। আমার আরো এক বন্ধু এসেছে। সে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বুম্বা।'

'কেন, বাইরে কেন? ভেতরে আসতে বল।'

এই সব কথার মাঝে তাতন কিন্তু সমস্ত ঘর এবং ঘরের মালিককে ভাল করে দেখে নিচ্ছিল। যদিও ঘরটা অন্ধকার, তবু মোটামুটি আন্দাজ করা যায়। সাবেকি আমলের সব আসবাবপত্রে ঠাসা। পুরনো অয়েল পেন্টিং, ভারী লোহার সিন্দুক, বিরাট আকারের পালঙ্ক, গোল সাদা পাথরের সেন্টার টেবিল টেবিলের ওপর নানান রকম ওষুধের শিশি সাজানো। খান দুই-তিন চেয়ারও ছিল। ঘরের একদিকে একটা বিরাট আলমারি। নিশ্চয় মেহগিনি কাঠের। একটা বহু পুরনো তানপুরা ঘরের এক কোণে দাঁড় করানো রয়েছে। দাদু পালঙ্কের ওপর শোয়া অবস্থায় ছিলেন। রংটা নিশ্চয় এককালে ফর্সা ছিল। এখন তামাটে। অন্ধকারে

তাতনের তাই মনে হ'ল। ধবধবে সাদা দাড়ি। একরাশ সাদা বাবরি চুল। বহু মূল্যবান একটা চাদরে তাঁব দেহ ঢাকা ছিল। হাতে গোটা দুই-তিন দামি পাথরের আংটি। পাথরগুলো অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করছে। এই সব দেখতে-দেখতে হঠাৎ তাতন কয়েকটা অদ্ভুত প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা দাদু, আপনার হাতের ঐ আংটিগুলো খুব দামি—না?'

দাদু একটু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ। নিশ্চয়। এ সব তিন-চার পুরুষ আগের সম্পত্তি। আমি পেয়েছি আমার বাবার কাছ থেকে।'

'বরাবরই আপনি ওগুলো পরে থাকেন?'

'হ্যাঁ। কেন বলতো?'

'আংটিগুলো খুব ঢিলে হয়ে গেছে। মানে, অসাবধানে হাত থেকে খুলে যেতে পারে।'

কি জানি কেন, একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাতনকে দেখলেন রাঘবেন্দ্র চৌধুরী। তারপর আংটিগুলো আঙুলে ভাল করে বসিয়ে দিতে-দিতে বললেন, 'না, পড়বে কেন? আগে এগুলো ঠিকই হ'ত। ইদানীং বুড়ো হয়েছি, আঙুলগুলো রোগা হয়ে গেছে। তোমার দৃষ্টি তো বেশ ভাল।'

ফস্ করে শুভ্র বলে ফেলল, 'হবে না? ও যে গোয়েন্দা নীল ব্যানার্জীর সাকরেদ।'

আবার ভ্রূ কোঁচকালেন রাঘবেন্দ্র, 'গোয়েন্দা নীল ব্যানার্জী? সে কী প্রফেশন্যাল?'

তাতনই উত্তর দিল, 'না, শখ করে একটু-আধটু গোয়েন্দাগিরি করেন। ও কিছু না। আচ্ছা দাদু, আপনাদের পুজোর আর কতোদিন বাকি আছে?'

'এখনো দিন পনেরো।'

'তা আর কেউ আসবে না?'

'জানি না। সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তবে বড় খোকা চিঠি দিয়েছে, আসবে। পুজোর এক সপ্তাহ আগে। আসলে কী জান, যার ইচ্ছে হবে আসবে। নইলে আসবে না। আমার কারোর ওপরই কোনো দাবি বা ক্ষোভ নেই।'

'আচ্ছা দাদু,' এবার শুভ্রই বলল, 'আপনাদের সেই বিখ্যাত কালীর মূর্তি কোথায় আছে?'

'মন্দিরে। আসার সময় তোমাদের নজরে পড়েনি? আমি গণেশকে বলে দোব, বিকেলে তোমাদের দেখিয়ে আনবে। তবে আসল জিনিসটি এখন দেখতে পাবে না।'

'আসল জিনিস মানে?'

রত্নহার। নবরত্নের মালা। দুষ্প্রাপ্য জিনিস। সারা পৃথিবীতে ও জিনিস আর দ্বিতীয় নেই।'

হঠাৎ তাতন বলল, 'তা সে রত্নহার দেখা যাবে না কেন?'

'ও জিনিস কী আর সব সময় কালীর গলায় পরিয়ে রাখা যায়? বছরে একটা দিনই মায়ের গলায় রেখে পুজো হয়, তারপর চলে যায় গুপ্ত সিন্দুকে।'

'গুপ্ত সিন্দুক?'

'হ্যাঁ, গুপ্ত সিন্দুক। একমাত্র আমি আর গণেশ ছাড়া চৌধুরীবাড়ির আর কেউ জানে না সে সিন্দুক কোথায় আছে। পুজো পর্যন্ত তো তোমরা রইলেই। দেখবে, কী অপূর্ব সেই রত্নহার। চোখ ফেরানো যায় না।'

'অত দামি মালা, পুজোর সময় ডাকাতিও তো হতে পারে?'

'তুমি ঠিকই বলেছ তাতন। সে ভয় যে একেবারে নেই তা নয়। তবে অন্তত পঞ্চাশজন বাঘা বাঘা লাঠিয়াল থাকে মন্দিরের চারপাশে। সে রকম ঘটনা তো এই দুশো কুড়ি বছরে কোনোদিনও ঘটেনি, ওসব ভেবে আর কী লাভ?'

এমন সময় গণেশ হালদার এসে ঘরে ঢুকল, 'কর্তাবাবু, এদের খাবার দেওয়া হয়েছে।'

বৃদ্ধ যেন হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখ দিকি কথায়-কথায় আসল কথাই ভুলে গেছি। যাও দাদুরা, তোমরা হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও। তোমাদের আর এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ হ'ল না। পরে হবে। গণেশ—'

'বাবু—'

'ওপাশের বড় ঘরটা, মানে, ছোট দাদাবাবুর ঘরটা এদের খুলে দাও। এর থেকেও বড় পালঙ্ক আছে! নিশ্চয় তোমাদের তিন বন্ধুর কোনো অসুবিধা হবে না।'

'না না, অসুবিধা আবার কী?' বলেই ওরা বেরিয়ে এল গণেশ হালদার সমেত। বাইরে এসে দেখে, বুম্বা আকাশের দিকে তাকিয়ে একমনে নখ খেয়ে চলেছে। তাতন এগিয়ে গিয়ে বলল, 'চ, আর নখ খেতে হবে না। খাবার রেডি।'

॥ পাঁচ ॥

তিনজনেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙল গণেশ হালদারের ডাকে। ধড়-মড়িয়ে উঠে দেখল, শেষে বিকেলের অন্ধকার নেমে আসছে। মাথা উঁচু বড় বড় গাছের ডালে হাজার হাজার ঘরেফেরা পাখির কিচির-মিচির। বাইরের দিকে তাকিয়েই তাতন বলল, 'ইস্, ভেবেছিলাম বিকেলে মন্দিরটা দেখব, দেখা হ'ল না।'

গণেশ হালদার বলল, 'কেন, না-দেখার কী আছে? একটু পরেই তো সন্ধ্যা-আরতি হবে। তখনি দেখবে। তার আগে চা-টা খেয়ে নাও।'

গণেশ হালদারের ঠিক পিছনেই একজন ঘোমটা-দেওয়া মাঝবয়েসী স্ত্রীলোক চায়ের ট্রে হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। গণেশ হালদার ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওগুলো নিয়ে সঙের মতো দাঁড়িয়ে রইলে কেন? নামিয়ে রাখ ওখানে।'

ট্রে নামিয়ে সে চলে গেল। গণেশ হালদারও বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'চা-টা খেয়ে তোমরা তৈরি হয়ে নাও। আমি কর্তাবাবুকে ছানা খাইয়ে আসছি।'

ওরা যখন তৈরি হয়ে বেরুল তখন সন্ধে হয়ে গেছে। তিনজনেই সঙ্গে টর্চ এনেছিল। বাগানের পথ ধরে চলতে কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না। বাগানের ঠিক মধ্যিখানেই পুরনো মন্দির। বেশ বড় সড়, তবে জরাজীর্ণ। মন্দিরের ঠিক পিছনেই একটা বিরাট বটগাছ। চারপাশ দিয়ে তার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে যেন মন্দিরটাকে আগলে রেখেছে।

ওরা সবে মন্দিরের সিঁড়িতে পা দিয়েছে, হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে বিকট হি-হি শব্দে হেসে উঠল। চারিদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে হাসির শব্দটা এমনই অপ্রত্যাশিত যে, তিনজনেই চমকে উঠেছিল। তিনজনেই মুখ ঘুরিয়ে দেখল, একমাথা উস্কোখুস্কো চুল আর দাড়িগোঁফের আবরণে ঢাকা একজন মাঝ-বয়েসী লোক। গায়ের রঙটাও মিশমিশে কালো। তাতন ওর মুখে টর্চের আলো ফেলেছিল। লোকটা হঠাৎ হাসি থামিয়ে যেন ক্ষেপে গেল, 'ভেবেছিস, আমার সব কেড়ে নিয়ে তোরা বাঁচবি? তা হবে না। মরবি—মরবি, তোরাও মরবি—সবাই মরবে। চৌধুরীবাড়িতে পাপ ঢুকেছে। কেউ বাঁচবে না। আমি সব জানি। সব ফাঁস করে দোব।'

হঠাৎ গণেশ হালদার ধমকে উঠল, 'কি হচ্ছে কী উমা? যা—ভাগ্ এখান থেকে। ছোট ছেলেদের ভয় দেখাচ্ছিস কেন?'

উমা কী বুঝল কে জানে, আবার সে সেই ভয়-ধরানো হি-হি হাসি হাসতে-হাসতে ছুটে অন্ধকার বনের মধ্যে ঢুকে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।

শুভ্রই প্রশ্নটা করল, 'ও লোকটা কে গণেশ দাদু?'

'আর বোল না। ওর নাম উমা। উমা পাগ্‌লা। আগে বাগানের মালী ছিল। বছর দশেক আগে হঠাৎ কলেরা হয়ে এক রাত্রে ওর মা, মেয়ে আর বৌ তিনটেই মরে যায়। ও তখন এখানে ছিল না। কী একটা কাজে শহরে গিয়েছিল। সেই থেকে ওর মাথার গণ্ডগোল। এখন সামনে যাকে পায় তাকেই ঐ সব বলে। ও নিয়ে তোমরা মাথা ঘামিও না। চল, ঠাকুর দেখবে চল।'
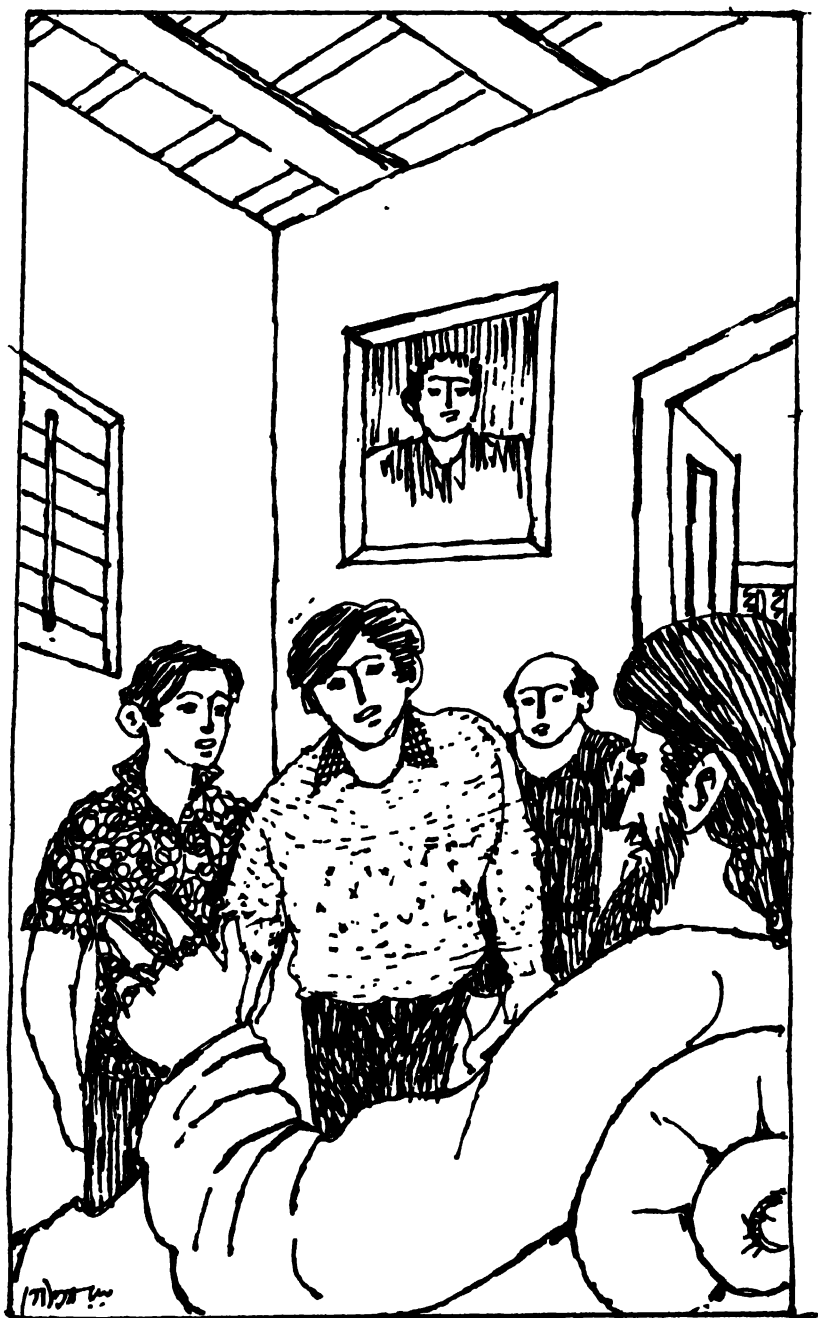
গণেশ হালদার, বুম্বা আর শুভ্র সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। তাতন কিন্তু তখনও অন্ধকার বাগানের দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর মাথায় তখন একটা কথাই ঘুরছিল—উমা পাগ্‌লা ঐ কথা-কেন বলল, চৌধুরীবাড়িতে পাপ ঢুকেছে? কেউ বাঁচবে না? যার সব গেছে সে অনেক সময় রাগের বশে অন্যের সর্বনাশ চায়, কিন্তু তার সঙ্গে চৌধুরীদের পাপের কী সম্পর্ক? লোকটা বলল, ও সব জানে। সব ফাঁস করে দেবে। কী জানে ও? হঠাৎ ও সম্বিত ফিরে পেল, মন্দিরের সিঁড়ির মাথা থেকে বুম্বা ডাকছে, 'এই যে ক্ষুদে গোয়েন্দা, উমা পাগ্‌লার মধ্যে আবার রহস্যটহস্য কিছু খুঁজে পেলে নাকি? থাকলে পরে চিন্তা ক'রো। এখন উঠে এস।'

তাতন কিছু না বলে চিন্তিতমনে ওপরে উঠে এল। মন্দিরে তখন আরতি হচ্ছে। বছর পঞ্চাশের এক পুরোহিত লাল কাপড় পরে দেবীর আরতি করছেন। কালীর অনেক রকম মূর্তি ও এর আগে দেখেছে। কিন্তু এমন নিকষ কালো পাথরের ভয়ঙ্করদর্শন মূর্তি এর আগে কোথাও দেখেনি। প্রায় তিন ফুট উঁচু চকচকে কালো পাথর থেকে একটা অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়ে পড়েছে। টকটকে লাল জিভ, টকটকে লাল বড় বড় চোখ। সত্যিই দেখলে ভয় লাগে। যে শিল্পী এ মূর্তি গড়েছে, তাকে বাহবা দিতে হয়। পাথর কেটেই তৈরি কালো চুলের রাশ পিছনে যেন উড়ছে। রুপোর বড় সিংহাসনে দেবীকে বসানো হয়েছে। পায়ের নিচে সাদা পাথরের মহাদেব—ফুলের আড়ালে ঢাকা। দেবীর গলায় পাথরের তৈরি নরমুণ্ডমালা। সদ্য পরানো লাল পঞ্চমুখী জবার মালাও রয়েছে। বুম্বা তাতনের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'কই রে, আলোটালো তো বেরুচ্ছে না।'

'আলো?'

'হ্যাঁ, ঐ যে শুভ্র বলল, রত্নহার থেকে রঙবেরঙের আলো বেরোয়।'

'ওগুলো ফল্‌স্। আসল হার পরানো হবে বৈশাখের অমাবস্যার রাতে।'

'বাবা, এখানেও ফল্‌স্? নে চ, আর দেখার কী আছে?'

তাতনেরও বোধ হয় আর কিছু দেখার ছিল না। নীল ব্যানার্জীর মতো ওর ভ্রূ গেছে কুঁচকে। নিচের দাঁত দিয়ে ওপরের ঠোঁট কামড়ে ও যেন বিশেষভাবে কী চিন্তা করছে।

একটু পরেই মন্দিরটা পাক দিয়ে শুভ্র আর গণেশ হালদার ফিরে এল।

ফাঁকা বাগানে হুহু করে হাওয়া দিচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া' বোধহয় কোথাও বৃষ্টি হয়েছে। ওরা আর দাঁড়াল না।

তাতন কিন্তু তখনও জানত না চৌধুরীবাড়িতে ইতিমধ্যেই ওর জন্যে আরো একটা বিস্ময় জমা হয়েছে।

যথারীতি নিজেদের ঘরে এসে বুম্বা বিছানায় গড়ালো। শুভ্র গেল দাদুর সঙ্গে দেখা করতে। ওনার শরীর খারাপ। কেমন আছেন তাই খোঁজ নিতে গিয়েছিল। চিন্তিত তাতন টেবিলের ওপর টর্চটা রাখতে গিয়েই আবিষ্কার করল একটা ভাঁজকরা কাগজ। তাড়াতাড়ি সেটা খুলে দেখল, আবার সেই একই উপদেশ, 'খোকাবাবুরা, বড় গভীর রহস্য আর ষড়যন্ত্র। চোখ আর কান খোলা রেখো। উমা পাগ্‌লাকে হেলাফেলা ক'রো না। অনেক কিছু জানতে পারবে। আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি। ইতি তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী।'

চিঠিটা বুম্বার হাতে ধরিয়ে দিয়েই তাতন ছুটে গেল গণেশ হালদারের খোঁজে। বেশি দূর যেতে হ'ল না। গণেশ হালদার ওদের ঘরেই আসছেন। ওকে দেখতে পেয়ে তাতন বলল, 'এ বাড়িতে আজ কোনো নতুন লোক এসেছিল?'

হঠাৎ যেন চমকে উঠল গণেশ হালদার। নিজেকে সামলে নিয়ে তাতনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সামনে পুজো। কত লোকই তো আসবে।'

'আজ এসেছিল কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

'এসেছিল। কিন্তু একথা জিগ্যেস করছ কেন?'

'দরকার আছে। লোকটাকে আপনি চেনেন?'

'কী করে চিনব? এই প্রথম এ বাড়িতে এল।'

'বলল রাজস্থান থেকে এসেছে, তাই না?'

'হ্যাঁ। তুমি জানলে কেমন করে?'

'সেকথা থাক, লোকটা আর কী বলল?'

তাতনের প্রশ্নে একটু অবাক হয়ে গণেশ হালদার বলল, 'ধাপ্পাবাজ লোক। বলে কিনা কর্তাবাবু নাকি তাকে চিঠি লিখে আসতে বলেছে। কিন্তু আমি জানি উনি ওরকম চিঠি কাউকে দেননি।'

'কী করে জানলেন?' তাতনের কণ্ঠে এখন পুলিসী জেরা।

'জানব না? কর্তাবাবুর সব চিঠিই তো আমি পোস্ট করি।'

'তাহলে আমরা আসব একথা আপনি জানতেন না কেন?'

'অ্যাঁ', থতমত খেল গণেশ হালদার, কিন্তু তা মাত্র মুহূর্তের জন্যে তারপরই বলল, 'চিঠির ভেতরে কী লেখা থাকে তা তো আর আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়।'

'তাহলে আপনার পক্ষে এটা জানাও সম্ভব নয় যে, দাদু ঐ লোকটাকে আসতে বলেছিলেন কি না। তা লোকটা আর কী বলল?'

'বাবুর সঙ্গে কী কথা হয়েছে তা আমি জানি না, তবে যাবার সময়ে নিজের

মনেই বিড় বিড় করছিল, 'বহুৎ তাজ্জব, বহুত তাজ্জব।'

'হুঁ। আচ্ছা, লোকটাকে কী আপনিই সদর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন, না, সে একাই চলে গিয়েছিল?'

'আমিই তাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিলুম।'

'কিছু মনে করবেন না গণেশ দাদু, আর একটা প্রশ্ন করছি আপনি না থাকলে, এ বাড়ির দোতলায় বাইরের লোকের পক্ষে কী উঠে আসা সম্ভব?'

'বড় কর্তার মহল এখন শ্মশানপুরী। জনাকতক ঝি-চাকর ছাড়া আত্মীয়-স্বজন কেউ থাকে না। তার ওপর কর্তা শয্যাগত। কারো যদি কুমতলব থাকে তাহলে তার পক্ষে দিনের বেলা আসা সম্ভব। রাত্রে অসুবিধা আছে। কারণ, বারান্দার দরজা রাত্রে বন্ধ থাকে। কিন্তু তুমি হঠাৎ এসব প্রশ্ন করছ কেন?'

'না, এমনি।' বলেই তাতন নিজের ঘরে ফিরে এল।

বুম্বা ওৎ পেতে ছিল। তাতন ঘরে ঢুকতেই বলল, 'ব্যাপারখানা কী বল্ তো? এই শুভাকাঙ্ক্ষীটি কে? বার বার চোখ কান খুলে রাখতেই বা বলছে কেন?'

'ঠিক জানি না। তবে কয়েকটা ব্যাপারে বড় খট্‌কা লাগছে। আর একটু ভেবে নিই। তারপর বলব।'

এরপর তেমন কোনো কথা হ'ল না। ন'টার মধ্যে খাওয়া দাওয়া শেষ করে তিনজনেই শুয়ে পড়ল। শুভ্র আর বুম্বা কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে কাদা। কিন্তু তাতনের মাথায় তখন একরাশ চিন্তা। সকাল থেকে ঘটে যাওয়া অনেকগুলো অসঙ্গতি ওকে ঘুমুতে দিচ্ছিল না। হাতে 'র' ছাপ দেওয়া লোকটা কে? সে যাকে সন্দেহ করছে যদি সে-ই হয় তাহলে সে এখানে কেন? কী তার উদ্দেশ্য? বার বার বলছে চোখ কান খুলে রাখতে। কেন? কী জন্যে? কোথাও কিছু ঘটেছে? না, ঘটবে? এ বাড়ি থেকে ফিরে যাবার সময় লোকটা বলছে 'বহুৎ তাজ্জব, বহুৎ তাজ্জব'। তাজ্জব হবার মতো কী ঘটনা ঘটল? রাঘবেন্দ্র চৌধুরী তাকে নাকি চিঠি লিখে আসতে বলেছিলেন। অথচ গণেশ হালদার বলছে তা নাকি ঠিক নয়। রানা চৌধুরী তাকেও আসার জন্যে চিঠি দিয়েছিলেন। অথচ স্টেশনে লোক পাঠাতে ভুলে গেলেন। এটা কী ইচ্ছাকৃত, না, সত্যিই তিনি ভুলে গেছেন? রানা চৌধুরীর হাতে তিনটে আংটি আছে। অথচ তিনটেই আংটিই ঢিলে। এ রকম হয়? সব থেকে বড় খট্‌কা উমা পাগ্‌লা। ও বলছে, সব কিছু ফাঁস করে দেবে। কী ফাঁস করতে চায় ও? তবে কী চৌধুরীবাড়িতে লুকনো কোনো ঘটনা আছে? ওদিকে মিঃ 'র' বলছেন উমা পাগ্‌লাকে হেলাফেলা না করতে। অনেক কিছু নাকি জানা যাবে। তার মানে, জানবার মতো কিছু ব্যাপার আছে। সেগুলো কী? এই সব

ভাবতে-ভাবতে কখন যেন তাতনের চোখে তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ ও চম্‌কে উঠল ভয়-ধরানো বিকট হাসির আওয়াজে। তাড়াতাড়ি উঠে জানলার কাছে গেল। আকাশে ম্লান জ্যোৎস্না আর বনের অন্ধকার একটা রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি ক'রেছে।

'মরবে, সব মরবে। সব ফাঁস করে দোব। কাউকে ছাড়ব না......।'

উমা পাগ্‌লা চিৎকার করতে-করতে ততক্ষণে বনের মধ্যে ঢুকে গেছে। একমাত্র ঝিঁঝিঁর ডাক ছাড়া আর সব কিছু নীরবতার মধ্যে ডুবে গেল। আরো কিছুক্ষণ পর তাতন এক গ্লাস জল খেয়ে শুয়ে পড়ল।

॥ ছয় ॥

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল কে জানে! হঠাৎ তাতনের ঘুম ভেঙে গেল। কানের কাছে বুম্বার ফিসফিসে গলা, 'তাতন—তাতন!' অন্ধকারে বুম্বার মুখ দেখা না গেলেও তাতন ওর গলার উত্তেজনাটা বেশ বুঝতে পারল। নিশ্চয় কিছু একটা ঘটেছে, নইলে বুম্বার মতো ডানপিটে ছেলে চট্ করে নার্ভাস্ হয়ে যায় না। 'কী হয়েছে, কী হয়েছে তোর? ওরকম করছিস কেন?'

'কিছু শুনতে পাচ্ছিস?'

তাতন চালাক ছেলে। আর কোনো প্রশ্ন না করে ও কানটাকে সজাগ করে পেতে রাখল কিছু শোনার জন্যে। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছে বৈকি। কে যেন বারান্দায় পায়চারি করছে। আওয়াজটা খুব চাপা কিন্তু স্পষ্ট। শুভ্র তখনও ঘুমচ্ছিল। তাতন আর ওকে জাগাল না। নিঃশব্দে বালিশের নিচে রাখা টর্চটা নিয়ে ধীরে-ধীরে দরজার কাছে গেল। আবার কান পাতল দরজার গায়ে। রানা চৌধুরীর ঘরের দিক থেকে পায়ের আওয়াজটা যেন এদিকেই আসছে। বুম্বা ততক্ষণে তাতনের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

পদশব্দ খানিকটা এগিয়ে এসে হঠাৎ থেমে গেল। তাতন আর বুম্বা উৎকর্ণ। ধীরে-ধীরে আবার রানা চৌধুরীর ঘরের দিকে আওয়াজটা এগুতে লাগল। তাতন প্রায় নিঃশব্দে দরজার খিল খুলে ফেলল। চলার আওয়াজটা ততক্ষণে অন্যপ্রান্তে চলে গেছে। অতি সন্তর্পণে তাতন দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করল। কোকিলের গায়ের রঙের মতো বারান্দাটা অন্ধকার। কিছুই ঠাহর করা যাচ্ছে না। রাত নিশ্চয় এখন অনেক। কারণ, তাতন শুতে যাবার আগে জ্যোৎস্নার আলো দেখেছিল। এখন আলো কমে গেছে। হঠাৎ পায়ের শব্দ তাতনের ঘরের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল। এক ইঞ্চি ফাঁক থেকে আধ ইঞ্চিতে নামিয়ে এনে দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করল,

যদি ঐ চলমান শরীরের মালিককে চেনা যায়। একমাত্র কালো সিল্যুট ছাড়া আর কিছুই বোঝা গেল না। হঠাৎ বুম্বা ফিসফিস করে উঠল, 'লোকটা কে রে? চিনতে পারলি?' তাতন চিমটি কেটে ওকে থামালো। অর্থাৎ এখন কোনো প্রশ্ন নয়।

আরো দু-একবার ঐভাবে পায়চারি করার পর হঠাৎ আওয়াজটা একেবারে থেমে গেল। প্রায় মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পরও ওরা আর কোনো পায়ের আওয়াজ বা কাউকে পায়চারি করতে দেখল না। একেবারে সন্দেহমুক্ত হবার পর তাতন আর বুম্বা নিঃশব্দে বারান্দায় বেরিয়ে এল। ঘরের মধ্যে থেকে বারান্দাটা যতটা অন্ধকার মনে হচ্ছিল এখন কিন্তু অতটা মনে হ'ল না। আকাশে ততক্ষণে শেষ প্রহরের ক্ষীণ আভা। সেই আভাটুকুর যৎসামান্য বারান্দায় ছড়িয়ে পড়েছে। ওরা কিন্তু কাউকেই দেখতে পেল না। তাতন আর বুম্বা দু'জনেই রানা চৌধুরীর ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। সেখানেও কেউ নেই। আলতো করে কর্তার ঘরের দরজায় তাতন এবার চাপ দিল। ভেতর থেকে বন্ধই রয়েছে। দরজায় একবার কান পাতল। কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ নেই।

রানা চৌধুরীর ঘরটা একেবারে শেষ প্রান্তে। কারণ, তারপরই পাঁচিল উঠে ছোট কর্তার অংশ আলাদা করেছে। ফিরে আসতে-আসতে পর পর তিনটে ঘরেই দরজায় ঠেলা দিয়ে দেখল। সব ঘরই বন্ধ।

ওরা ফিরে এল নিজেদের ঘরে। দরজায় খিল দিতে-দিতে বুম্বা বলল, 'কী ব্যাপার বলতো? এত রাত্রে কে ওরকম পায়চারি করছিল?'

'কিছুই মাথায় ঢুকছে না। দোতলায় আমরা তিনজন আর রানা চৌধুরী ছাড়া আর তো কেউ নেই—'

'তবে কী রানা চৌধুরী নিজেই?'

'কিন্তু ওঁর তো বিছানা ছেড়ে ওঠাই বারণ।'

'হয়তো ডাক্তারের বারণ না শুনেই—'

'কিন্তু শুভ্রর দাদুকে ঐরকম চপল স্বভাবের বলে তো মনে হ'ল না।'

'আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, হয়তো উনি রাত্রে প্রয়োজনের জন্যে কোনো লোক নিয়ে শুয়েছেন। হয়তো সে-ই—'

'হতে যে পারে না তা নয়। সেটা কাল খোঁজ নিলেই হবে। কিন্তু লোকটার পায়চারি করার ধরন দেখে তোর কিছু মনে হয়নি?'

'কী আবার হবে? পায়চারি ইজ পায়চারি। ম্যাক্সিমাম্ বলতে পারিস সে কিছু চিন্তা করছিল।'

'ইয়েস, আমার সেইটাই বক্তব্য। ধীরে-ধীরে, থেমে এবং দাঁড়িয়ে পায়চারি

করার মধ্যে একটা চিন্তার ব্যাপার থেকে থাকে।'

'মরুকগে যাক! আমাদের অত কী দরকার? যার ইচ্ছে হয়েছে সে পায়চারি করেছে। চ, শুবি চ।'

অত রাত্রে তাতনেরও আর মাথায় কিছু ঢুকছিল না। ঘুমের মধ্যে শুভ্র পাশ ফিরে শু'ল। আর কোনো কথা না বাড়িয়ে যে যার মতো শুয়ে পড়ল।

॥ সাত ॥

পরদিন ঘুম ভাঙতে বেশ কিছুটা দেরি হ'ল। শুভ্রই ওদের দুজনকে ঠেল্যাঠেলি করে তুলল, 'বাব্বা! এখানে এসে যে সব কুম্ভকর্ণ হয়ে গেলি! নে নে, ওঠ্। চা-টা খেয়ে একটু ঘুরে আসি। গণেশ দাদু দুবার এসে ফিরে গেছেন।'

গত রাত্রের কথা তাতন আর বুব্বা তখনই শুভ্রর কাছে ভাঙল না। চা-জলখাবার খেয়ে বেরুবার মুখেই দেখা গেল গণেশ হালদারের পেছন-পেছন এক মধ্যবয়েসী ভদ্রলোক ঢুকছেন। পরিচয় না থাকলেও বোঝা যায় উনি ডাক্তার। কারণ, গলায় স্টেথোস্কোপ ঝুলছে। আজকাল শহরে ঐভাবে কোনো ডাক্তার স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে রুগী দেখতে যান না।

গণেশ ওদের দেখে জিজ্ঞাসা করল, বেরুচ্ছ নাকি?'

শুভ্র বলল, হ্যাঁ, একটু এদিক ওদিক—'

'বেশি দূরে কোথাও যেয়ো না। এদিকের পথঘাট তো সব জানা নেই তোমাদের।'

গণেশ হালদার ডাক্তারকে নিয়ে ওপরে উঠছে, হঠাৎ তাতন মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা গণেশ দাদু—'

'হ্যাঁ ভাই, বল।'

'একটা কথা জিজ্ঞাসা করার ছিল।'

গণেশ হালদার একবার ডাক্তারের দিকে তাকাল। ডাক্তার কোনো কথা না বলেই সোজা ওপরে চলে গেলেন। বেশ বোঝা গেল, এ বাড়িতে ডাক্তারের অবারিতদ্বার।

গণেশ হালদার নিচে নেমে এসে একটু রসিকতার সুরে বলল, 'খুব জরুরী কথা বলে মনে হচ্ছে যেন?'

'নাঃ, তেমন কিছু না। আচ্ছা, বড় দাদু তো এখন অসুস্থ। তা রাত্রে কী উনি একাই শোন?'

'একা? না, একা কেন হবে? অবশ্য আগে উনি বরাবরই একা শুতেন। তবে

ইদানীং ডাক্তারের পরামর্শ মতো একজন লোক রাত্রে ওনার ঘরে মাটিতে শুয়ে থাকে।'

'কালও ছিল?'

'হ্যাঁ। কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

তাতন সে প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে খানিকটা জেরার সুরে বলল, 'বারান্দা আর সিঁড়ির মুখে ঐ যে দরজাটা রয়েছে, ওটা কী প্রতিদিনই বন্ধ থাকে?'

কিছু বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাতনের দিকে তাকিয়ে গণেশ হালদার বলল, 'হ্যাঁ, থাকে। সেটাই তো নিয়ম।

'চাবি কার কাছে থাকে?'

'একটা আমার কাছে, আর একটা কর্তাবাবুর কাছে।'

'কাল রাত্রে কী আপনি ওপরে এসেছিলেন? মানে, এই ধরুন, তিনটে নাগাদ?'

'না।' এবার যেন গণেশ হালদার তাতনের মাত্রা-ছাড়ানো প্রশ্নে বিরক্ত। একটু সময় নিয়ে বলল, 'এত সব প্রশ্ন করছ কেন? কিছু হয়েছে কী?'

'কাল রাত্রে বারান্দায় কেউ ঘোরাঘুরি করছিল।'

'মানে?'

'মানেটা বুঝতে পারছি না বলেই তো আপনাকে প্রশ্ন করছি।'

এবার পাল্টা প্রশ্ন করল গণেশ হালদার, 'রাত তিনটে বললে, তাই না? তা অত রাত্রে তোমরাই বা জেগে ছিলে কেন?'

'ঘুম আসছিল না, তাই। এ ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন?'

'না। বেশি রাত জাগা আমার বারণ।'

গণেশ হালদার চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ থেমে গিয়ে ফিরে এসে বলল, 'খোকাবাবু, এ বাড়িতে তোমরা এসেছ এই ক'দিন। থাকবে কালীপুজো পর্যন্ত। আনন্দ করবে, ঠাকুর দেখবে, যাত্রা শুনবে, তারপর চলে যাবে। কী দরকার তোমাদের সাতে-পাঁচে থাকার?'

হঠাৎ শুভ্র বলল, 'কী ব্যাপার, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'তাতনবাবু ঘুমের ঘোরে কি দেখতে কী দেখেছেন। অত রাত্রে বারান্দায় একমাত্র কর্তাবাবু ছাড়া আর কেউ থাকতে পারেন না। তা কর্তাবাবুর পক্ষে এখন কোনোমতেই সম্ভব নয় বারান্দায় পায়চারি করা। যাও, তোমরা বেড়িয়ে এস। বেশি দূর যেয়ো না। রাস্তা গুলিয়ে ফেলবে।' বলেই গণেশ হালদার তড়িঘড়ি ওপরে চলে গেল।

'কী ব্যাপার রে তাতন?' শুভ্রর প্রশ্ন।

'ব্যাপার? বুম্বা, সবটাই আমাদের দেখার ভুল, তাই না?'

বুম্বা বেশ ভারিক্কী চালে বলল, 'গণেশ হালদারকে ঠিক সুবিধেজনক মনে হচ্ছে না। ও নিশ্চয় কিছু জানে। চেপে গেল।'

'ধ্যাৎ, তোরা সব কী আরম্ভ করলি! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'চ, যেতে-যেতে বলব।' বলেই ওরা তিনজন ঠাকুরদালান পার হয়ে বাগানে গিয়ে পড়ল। তিনজনেই হাঁটছিল এলোমেলো—উদ্দেশ্যবিহীন। বৈশাখের সকাল। ঝলমলে রোদ। সবুজ বাগানে হাঁটতে ওদের ভালই লাগছিল। চলতে-চলতে তাতন বেশ সংক্ষেপেই গত রাত্রের সেই রহস্যময় পায়চারির ঘটনাটা খুলে বলল। শুনে শুভ্রও বেশ চিন্তিত হ'ল। কারণ ঘটনাটা সত্যিই রহস্যময়। রানা চৌধুরীর পক্ষে এখন হেঁটে বেড়ানো উচিত নয়, সম্ভবও নয়। একটা লোক ওনার ঘরে শুয়ে থাকে। একমাত্র তার পক্ষেই ঘুম না আসার জন্যে পায়চারি করা সম্ভব। আর সে যদি না হয় তাহলে আর কে হতে পারে? গণেশ হালদার? কী দরকার তার অত রাত্রে ঐভাবে পায়চারি করার? সে থাকে একতলায়। পায়চারি করার দরকার পড়লে নিচেই করবে। বারান্দার দরজা খুলে ওপরে এসে রহস্যজনকভাবে পায়চারি করবেই বা কেন? তার ওপর মূর্তিটা শেষ পর্যন্ত মিলিয়ে গেল দাদুর ঘরের কাছ বরাবর। তার কী কোনো অসৎ উদ্দেশ্য আছে? এ-বাড়ির, বলতে গেলে, কাউকেই শুভ্র চেনে না। মাত্র একদিনের আলাপ। তবে কী ট্রেনের সেই মিঃ 'র', যে খবরের কাগজে চিরকুট পাঠিয়েছিল, 'সামনে রহস্য চোখ কান খুলে রেখো' তার কথাই ঠিক?

এইসব প্রশ্ন যে কেবল শুভ্রর মাথায় ঘুরছিল, তা নয়। তাতনের মুখ দেখলেই বোঝা যায়, তারও মাথায় পোকা কিলবিল করছে। ব্যতিক্রম বুম্বা। এত সব চিন্তার মধ্যে ও কোনোদিনও থাকে না। বুম্বা ততক্ষণে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে বাগানের উঁচু গাছের নিচু ডাল ধরার চেষ্টা করছে।

এলোমেলো হাঁটতে-হাঁটতে কখন যেন মন্দিরের কাছে চলে এসেছিল। এক সময় শুভ্র প্রশ্ন করল, 'তুই বোধ হয় কিছু ভাবছিস?'

'ভাবনার ব্যাপার এসে যাচ্ছে রে। সাধারণ দৃষ্টিতে ঘটনাটা কিছুই নয় অথচ কোনো সঙ্গতি পাওয়া যাচ্ছে না। আচ্ছা, একটা প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারবি?'

'কী?'

'তোর দাদুকে তুই কবে চিঠি দিয়েছিলি?'

'ঐ তো, যেদিন আমরা 'মডার্ন টাইমস্' দেখলাম, তার পরদিনই।'

'মানে, আজ থেকে প্রায় তেরোদিন আগে?'

'হ্যাঁ।'

'আর আজ থেকে দশদিন আগে রানা চৌধুরীর মাইল্ড অ্যাটাক হয়। তার মানে, কোনো কিছু লেখা, চিন্তা করা, দশদিন আগে থেকে বন্ধ। তাহলে তোর দাদু চিঠিটা দিলেন কী করে? আর যদি তোর চিঠি পাবার সঙ্গে-সঙ্গেই উত্তর দিয়ে থাকেন, উনি তা মনে করতে পারলেন না কেন? চিঠির কথা শুনে এমনভাবে কথাটা বললেন যেন আদপেই উনি চিঠি দেননি! উনি যদি না দিয়ে থাকেন, তাহলে কে দিল তোকে চিঠিটা?'

'আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না।'

'তোর দাদুর হাতের লেখা নিশ্চয় তুই চিনিস না?'

'এই তো সবে ওঁকে দেখলাম। হাতের লেখা চেনার প্রশ্ন আসে কোত্থেকে?'

'মাসিমা, মানে, তোর মা নিশ্চয় চেনেন?'

'তা চেনেন বৈকি। ইদানীং তো ঐ চিঠিতেই যা কিছু সম্পর্ক বজায় ছিল।'

'তাহলে মানেটা কী দাঁড়াচ্ছে?'

শুভ্র কিছু বলতে যাচ্ছিল, বলা হ'ল না। হঠাৎ ওদের দৃষ্টি আটকে গেল বুড়ো বটের তলায়, যে বটটা মন্দিরটাকে আগলে দাঁড়িয়ে আছে। গাছের নিচে বসে আছে উমা পাগ্‌লা। আপনমনেই সে কি যেন বিড়বিড় করছে। শুভ্র আর তাতন উমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। হঠাৎ, বলা নেই কওয়া নেই, সে হি-হি করে হাসতে শুরু করল। তাতন কয়েক মিনিট ওকে লক্ষ্য করল। তারপর ধীরে-ধীরে ওর পাশে গিয়ে বসল। উমা পাগ্‌লা কিন্তু তাতনকে দেখেও দেখল না। নিজের মনে নিজের কাজ করে চলল।

'তোমার নাম উমা?'

তাতনের গলার আওয়াজে উমা ওর হাসি থামাল বটে, কিন্তু কোনো উত্তর না দিয়ে গা চুলকোতে শুরু করল। তাতন আবার ওকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী গো, কথা বলছ না কেন? তোমার নামই তো উমা?'

'তাতে তোর কী রে? আমার নাম উমাই হোক আর শিবই হোক। তুই কে?'

'আমি তাতন।'

'সেটা আবার কে? অ্যাঁ? কোথায় থাকিস তুই?'

'ঐ যে, ঐ বড় বাড়িটায়! জমিদারবাবুর বাড়ি।'

হঠাৎ ভ্রূ কুঁচকে গেল উমা পাগলার। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ও তাতনের দিকে তাকিয়ে রইল। ওর কথাবার্তায় তখন কেউ বলবে না যে ও পাগল। ততক্ষণে শুভ্র এসে

তাতনের পেছনে দাঁড়িয়েছে। শুভ্রকে দেখে উমা বলে উঠল, 'ইটি কে রে? তোর বন্ধু?'

'হ্যাঁ।'

'আগে তো তোদের কোনোদিন দেখিনি!'

'আমরা কাল এসেছি। বেড়াতে। চৌধুরীবাড়িতে কালীপুজো দেখে আবার চলে যাব!'

'সেই ভাল। এখানে থাকিস না। এখানে থাকলে সব মরবে। যারা আছে—সব মরবে।'

'কেন? সবাই মরবে কেন?'

'পাপ—পাপ। জমিদারবাড়িতে যে পাপ ঢুকেছে। সেই পাপে সব, সব মরবে—'

'তুমি কী করে জানলে, জমিদারবাড়িতে পাপ ঢুকছে? কিসের পাপ?'

হঠাৎ মুখে আঙুল দিয়ে উমা পাগ্‌লা এক ধরনের হিস্ হিস্ শব্দ করল, তারপর বলল, 'আমি জানি। আমি সব জানি। কিন্তু কাউকে বলব না।'

'কী জানো? কী বলবে না?'

'পাপ—পাপ। পাপ হবে না? আমার বৌকে মেরেছে, মাকে মেরেছে। তবু শান্তি হয়নি। আমার ছোট্ট মেয়েটাকে'—বলতে-বলতেই হঠাৎ সে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে দিল। তাতন আর শুভ্র কিন্তু কেউ এ অবস্থায় ওকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেলো না। কে জানে পাগলের খেয়াল কী হবে? হয়তো বা রাগের মাথায় মেরেটেরেই বসবে। হঠাৎ তাতনের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সে পকেট থেকে কয়েকটা টফি, যেগুলো ও আসার সময় হাওড়া স্টেশন থেকে কিনেছিল, তারই দু-একটা বার করে উমা পাগ্‌লার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'খাবে নাকি এগুলো? খুব ভাল খেতে। খেয়ে দেখ।'

খাবার-টাবারের ব্যাপারগুলো পাগলেরাও ঠিক বুঝতে পারে। নিমেষে সে তার শোক ভুলে গিয়ে খপ্ করে তাতনের হাত থেকে টফিগুলো তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিল। শুভ্র তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আরে আরে, কর কী! ওর কাগজগুলো আগে ছাড়াও। নইলে যে খেতে বিশ্রি লাগবে।'

কিন্তু পাগলের সে-কথায় কোনো কর্ণপাত নেই। সে কাগজসমেতই সেগুলো চিবোতে শুরু করে দিল।

'আরও নেবে?' বলে তাতন পকেট থেকে আরো দুটো বার করল। টফির মজা নিশ্চয় পেয়েছিল উমা। যেই সে আগের মতো ছোঁ মারতে গেল, তাতন

প্রস্তুত হয়েই ছিল, টুক্ করে হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, 'তাহলে বল।'

উমা কিছু না বলে ভ্রূ কুঁচকে তাতনের দিকে চেয়ে রইল। তাতন আবার তাগাদা দিল, 'বলবে না কী পাপ?'

'দে, দে আমাকে ওগুলো।'

'দোব তো। এ সবই তোমার। ঘরে আরও আছে, সেগুলোও দোব। কিন্তু তার আগে বল।'

'সবাই শুনতে পাবে যে।'

'এখানে কেউ নেই। কেউ শুনবে না। তুমি বল।'

'বলব?'

'হ্যাঁ, বল। না বললে কিন্তু এগুলো আর দোব না।'

কিন্তু ওরা যদি জানতে পারে?'

'কারা? কী জানতে পারবে?'

'ওই যে গো, ওরা।'

'কারা?'

'ওই যে, একটা লোক, সেদিন এলো।'

'কে এলো? কোথায় এলো?'

'নতুন লোক গো। কর্তাবাবুর কাছে গেল। তারপর একদিন—'

হঠাৎ উমার কথা যেন আটকে গেল। ভূত দেখার মতো চোখে সামনের দিকে তাকাল। তাতন আর শুভ্র পিছনে তাকিয়েই দেখল গণেশ হালদার কটমটিয়ে তাকিয়ে আছে উমা পাগ্‌লার দিকে। কী যেন হয়ে গেল উমা পাগ্‌লার। সে ঝটিতি উঠে দাঁড়াল। তারপর ওর সেই ভয়-ধরানো হাসি হাসতে-হাসতে বলে উঠল, 'বলে দোব সব বলে দোব। পাপ—পাপ। মরবে, সবাই মরবে—'

হঠাৎ পড়ি-কি-মরি করে উমা উল্টোদিকে ছুট লাগালো।

'দাঁড়া, তোর পাগলামি আমি ঘোচাচ্ছি। কর্তাবাবুকে দিয়ে এবার তোকে পাগলাগারদে যদি না পাঠাই তো আমার নাম গণেশ হালদার নয়।' তারপর তাতনদের দিকে ফিরে বলল, 'খোকাবাবুরা আর গল্প করার লোক পেলে না? পাগলছাগল লোক। খেয়ালের মাথায় যদি মেরে দেয় কী কামড়ে দেয়— কর্তাবাবুর কাছে গাল খেতে-খেতে আমার জীবন যাবে—নাও, চল দিকি এখন?'

'আপনি যান, আমরা একটু ঘুরেটুরে আসি।' বলে শুভ্র এগোতে গেল।

'কিন্তু কর্তাবাবু যে তোমাদের ডাকছেন।'

'ফিরে এসেই ওনার সঙ্গে দেখা করব।' বলে শুভ্র আর তাতন মন্দিরের দিকে
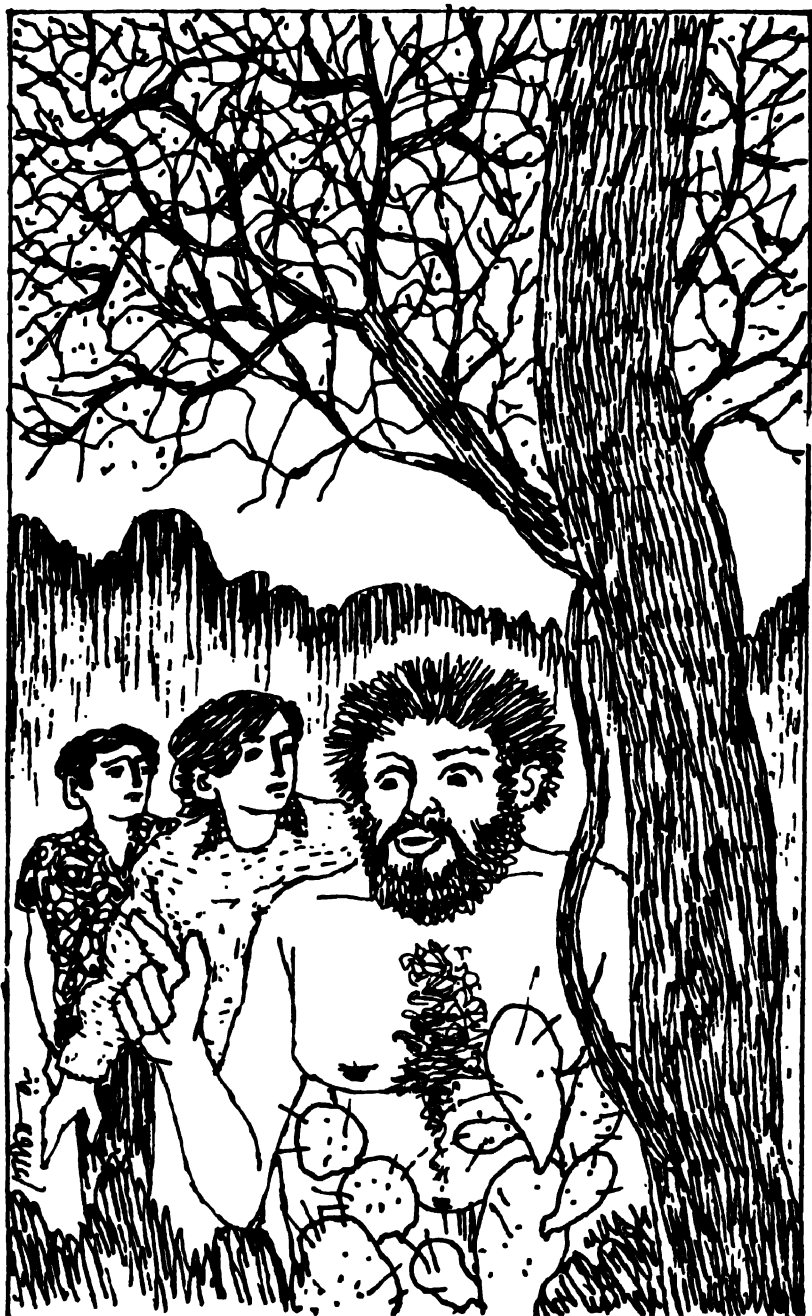
হাঁটা শুরু করল।

গণেশ হালদার কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গেল। হঠাৎ তাতনের খেয়াল হ'ল অনেকক্ষণ বুম্বাকে দেখেনি, 'হ্যাঁরে, বুম্বা গেল কোথায়?'

'তাইতো, ও তো আমাদের আগে-আগে যাচ্ছিল।'

তাতন আর শুভ্র বুম্বার নাম ধরে অনেকবার ডাকাডাকি করল। বাগান আর মন্দিরের চারপাশে অনেক করে খুঁজে দেখল। কিন্তু বুম্বার কোনো চিহ্নই নেই। শুভ্রর মুখে কিছুটা চিন্তার ছায়া। 'হারিয়ে গেল নাকি রে?' বলে ও তাতনের দিকে তাকাল।

'ধ্যাৎ, হারাবে, বুম্বা? দেখ হয়তো পুকুরধারে গিয়ে মাছ ধরা বা সাঁতার কাটার প্ল্যান করছে। চল তো পুকুরধারটা গিয়ে দেখি।'

রানা চৌধুরীর পুকুরটা ছিল মূল বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে। এটা নাকি মাছ-পুকুর। চারদিকে বিরাট বিরাট গাছের জঙ্গল। আগে হয়তো জঙ্গল এতটা ছিল না। এখন অজস্র বুনো লতা আর ছোট-ছোট গাছের মধ্যে চট করে পুকুরটা চোখে পড়ে না। কাঁটাবন, ফণীমনসা আর কুলগাছের ঝোপ-ঝাড় ভেদ করে ওরা পুকুরধারে এসে দাঁড়াল। লম্বা আর চওড়ায় পুকুরটা বেশ বড় আর নির্জন। মাছটাছ এখন আছে কিনা কে জানে! তবে কচুরিপানা আর শ্যাওলা আছে বিস্তর। ওখানেও বুম্বা নেই। নাম ধরে ডাকল বেশ কয়েকবার। কিন্তু কোথাও কোনো সাড়াশব্দ পেল না।

গাছাগাছালির জঙ্গল ভেদ করে ওরা বাগানের সীমানার ভাঙা পাঁচিলের ধারে এসে হাজির হ'ল।

'বাইরেটা একবার দেখলে হ'ত না?' শুভ্রর গলায় বেশ উদ্বেগের লক্ষণ।'

'তাই চ।' বলে নোনাধরা ইটের পাঁচিল টপ্‌কে ওরা সীমানার বাইরে চলে গেল।

মেঠো রাস্তা দু'পাশে চলে গেছে। রাস্তার ওপাশে ঘন বেতবন।

'দু' দিকেই তো সমান রাস্তা। কোনদিকে যাবি?'

'আমাদের কাছে দু'দিকই সমান, চ, বাঁদিকেই যাই।' বলে তাতন হাঁটা শুরু করল।

সরু মেঠো রাস্তার একদিকে চৌধুরীদের সীমানা। অন্যদিকে কোথাও জলা বা পুকুর, কোথাও বাঁশবন, কোথাও বা দু'একটা আটচালা। তাও বেশ দূরে দূরে। দু-একটা চাষীবৌকে দেখা গেল। একটা গ্রাম্য লোক সাইকেল চড়ে আসছিল। কাছাকাছি আসতেই তাতন জিজ্ঞাসা করল, 'এ রাস্তাটা কোথায় গিয়ে পড়েছে?'

'সোজা গেলেই পিচের রাস্তা। ডানদিকে গেলে স্টেশন। কোথায় যাবেন আপনারা?'

'এই একটু এদিক ওদিক—' বলে তাতন আর শুভ্র এগিয়ে চলল।

প্রায় মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর এসে গেল চৌধুরীদের মেন গেট। গেট ছাড়িয়ে আরো কিছুদূর যেতেই বাগানের মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর ভদ্রলোককে দেখতে পেল। বয়স প্রায় ষাট পেরিয়ে গেছে। গায়ে গেরুয়া পাঞ্জাবি চোখে গোল সোনালি চশমা। মেজাজটাও বেশ ভারিক্কী। চলতে চলতেই শুভ্র বলল, 'মনে হচ্ছে ছোট দাদু। মুখের সঙ্গে বেশ মিল রয়েছে। আলাপ করবি নাকি?

'দেখি—' বলে এগিয়ে গেল।

কিন্তু তার আগেই ভদ্রলোক নিজে থেকে এগিয়ে এলেন, 'তোমরা কী এখানে নতুন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কাদের বাড়িতে এসেছ?'

উত্তরটা শুভ্রই দিল, 'আজ্ঞে রাঘবেন্দ্র চৌধুরী আমার দাদু।'

প্রৌঢ়ের মুখ নিমেষেই পাল্টে গেল। 'অ'—বলে উনি চলে যাচ্ছিলেন।

'কিন্তু আপনি?'

'আমার নাম রমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।'

'তার মানে, আপনি আমার ছোট দাদু? বলেই শুভ্র ওঁকে প্রণাম করল। দেখাদেখি তাতনও।

'থাক্ থাক্। তুমি কার ছেলে?'

'আজ্ঞে, আমার বাবার নাম নীতিন চৌধুরী।'

'অর্থাৎ তুমি প্রতিমার ছেলে। তা হঠাৎ এখানে?'

'এমনি, বেড়াতে।'

'হুঁ। সময় করতে পারলে, আর বড় কর্তার পারমিশান পেলে, একবার এই ছোট দাদুর বাড়ি এসো। ঐ যে সামনেই আমার বাড়ি।'

রমেন্দ্রনারায়ণ আর দাঁড়ালেন না। তাতন ওঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে বলল, 'তোর ছোট দাদুর দেখছি বড় দাদুর ওপর রাগ আর অভিমান বিস্তর।'

'হ্যাঁ। বোধ হয় কোনো পারিবারিক কারণে। চ, ফেরা যাক। এতক্ষণে নিশ্চয় বুম্বা ফিরে এসেছে।'

ওরা ফিরছিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে পর পর এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটল

যার ফলে তাতনরা চৌধুরীবাড়ির ঐতিহাসিক রত্নহারকে কেন্দ্র করে এক অদ্ভুত রহস্যের মধ্যে জড়িয়ে গেল।

রানা চৌধুরীর বাড়ির কাছে সবে ওরা পৌঁছেছে, হঠাৎ একটা উনিশ-কুড়ি বছরের স্থানীয় ছেলে ওদের সামনে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের মধ্যে তাতন কার নাম?'

'আমিই তাতন। কেন, কী হয়েছে?'

ছেলেটা একটা ভাঁজকরা কাগজ এগিয়ে দিতে-দিতে বলল, 'এটা তোমাকে দিতে বলল।'

কাগজটা নিয়ে তাতন বলল, 'কে? কে দিতে বলল?'

'চিনি না। একটা হিন্দুস্থানী মতো লোক। বলল, তোমাদের মধ্যে যার নাম তাতন, এটা তাকে দিতে হবে। আমাকে একটাকা বকশিশ দিয়েছে।' বলে সে দু'পাটি দাঁত বের করে হাসতে লাগল।

তাতন ততক্ষণে কাগজের ভাঁজ খুলে ফেলেছে। শুভ্র ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করল, 'লোকটা গেল কোথায়?'

'কে জানে। চিঠিটা আর টাকাটা দিয়েই লোকটা হন্ হন্ করে ওপাশে 'ন্যাড়াবুড়ীর' জঙ্গলে ঢুকে গেল।'

'ন্যাড়াবুড়ীর জঙ্গলটা আবার কোথায়?'

'ঐ তো সামনে, এ রাস্তাটা যেদিকে বাঁক নিল, তার সামনে যে জঙ্গল, ওটাই ন্যাড়াবুড়ীর জঙ্গল।'

'ঠিক আছে, তুমি এখন যাও।' তাতন লেখাটা পড়তে-পড়তে বেশ গম্ভীর স্বরেই উত্তর দিল।

'কী লিখেছে রে?'

'পড়', বলে বেশ চিন্তিত মুখে তাতন বলল, 'পোড়ো আর বন-জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িগুলোর মধ্যে একটা-না-একটা রহস্য থাকেই, না রে শুভ্র?'

শুভ্র কোন উত্তর দিলনা। সে তখন লেখাটা পড়ছে, 'তাতানবাবু তোমায় আগেই বলেছি, সামনে রহস্য। মিথ্যে বলিনি, সত্যিই সামনে গভীর রহস্য।

আবার বলছি উমা পাগলাকে পাগল বলে উড়িয়ে দিওনা। আমি যে কোন একটা বিপদের আশঙ্কা করছি। নিচে একটা ছড়া আর কিছু আজগুবি শব্দসমষ্টি পাঠালাম। ধাঁধাও বলতে পার। তবে নিছক সময় কাটানোর জন্যে মামুলি ধাঁধা নয়। উত্তর খুঁজে পেলে বুঝতে পারবে চৌধুরীবাড়িতে একটা চক্রান্ত চলছে রত্নহার নিয়ে। এবার ছড়াটা পড়ো—

খুঁজে খুঁজে হয়রান
হও কেন ম্রিয়মান
নয়ন মোছ যতবার
রাকেশ হাসে ততবার

আসলে এটা সূত্র। এবার ধাঁধাটা পড়ো—

'স্বাধীনতা ধ্যানস্তান—ষড়রিপু তালহারা—মোটাসোটা নটবর—আয়ভিখু ভুষিমাল—খাই গিলে বারমুডা—ঝালাপালা আমি তুমি—হেলেদুলে যাবি তো যা—খাবেদাবে বারবার—নহবত খানদান—রামাশ্যামা হেলাফেলা—।'

আপাতদৃষ্টিতে কোন মানে নেই। কিন্তু হেলাফেলারও নয়। আর একটা কথা, রাঘবেন্দ্র চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করো রত্নহারটা ঠিক জায়গায় আছে কিনা সেটা ভাল করে দেখে নিতে। ওটার ওপর অনেকেরই লোভ। আবার পরে দেখা হবে। ইতি—তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী।'

তাতনের তখন চোখ কুঁচকে গেছে। বোকার মতো শুভ্র তাতনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই শুভাকাঙ্ক্ষীটি বড় ঝামেলায় ফেলছে তো! হাতের লেখাটা মিলে যাচ্ছে। সেই ট্রেনের লোকটা। কিন্তু তোর নাম যে তাতন সেটা ও জানল কী করে?'

'না-জানার কী আছে? ট্রেনে বসে অনেকবার আমার নাম ধরে ডেকেছিলি। যাক্‌গে, এখন আর কিছু জিগ্যেস করিস না। চল্ দেখি বুম্বা ফিরল কিনা।'

কিন্তু বাড়ি ফিরে দেখল, বুম্বা তখনও আসেনি। এবার সত্যিই তাতন চিন্তায় পড়ল। কারণ বুম্বা যতই ডানপিটে আর খামখেয়ালি হোক, ওদের দু'জনকে না বলে এতক্ষণ কোথাও থাকার ছেলে ও নয়। তবে কী কোনো বিপদ-আপদ হ'ল? আসলে নতুন চিঠিটা পেয়ে তাতন অনেক কিছু ভাবতে শুরু করেছে। প্রথমেই ওরা গণেশ হালদারের খোঁজ করল, কিন্তু পেল না। উনি যেন কী কাজে বেরিয়েছেন। ওরা অগত্যা বড় দাদুর ঘরে গেল। রাঘবেন্দ্র সেই একইভাবে শুয়ে আছেন। ঘরে আর কেউ নেই। শুভ্র বলল, 'দাদু, আপনি আমাদের ডেকেছিলেন?'

'কে? ও—হ্যাঁ। বোসো। এমনি সময়ে তোমরা এলে যে, আমি অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে রয়েছি। দু'দন্ড তোমাদের সঙ্গে যে গল্প করব, তাও ডাক্তারের বারণ।'

'না না, আমাদের তেমন কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, আপনি বরং সেরে উঠুন, তারপর—'

'ততদিন কী আর তোমরা থাকবে? হ্যাঁ, যে-কথা বলার জন্যে তোমাদের

ডেকেছি। আর ক'টা দিন পরেই পুজো। আমার পক্ষে তো আর এবারে কিছু করা সম্ভব নয়। কী করে যে সব কী হবে তাও বুঝতে পারছি না। তাই বলছিলাম, গণেশের সঙ্গে থেকে তোমরা যদি একটু কাজকর্ম করে দাও—'

উত্তরটা তাতনই দিল, 'আপনি কিছু ভাববেন না দাদু, আমরা আছি, পুজো আপনার আটকাবে না। আপনাকে কতদিন শুয়ে থাকতে হবে?'

'এখনও মাসখানেক।'

'আচ্ছা দাদু, একটা কথা জিগ্যেস করব, কিছু মনে করবেন না তো?'

'না তাতন, মনে করার কি আছে? তুমি বল।'

'দেবীর রত্নহার তো আপনার সেফ্ কাস্টডিতে আছে, তাই না?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

'না, এমনিই মনে হ'ল। খুব দামি জিনিস তো।'

'এ বাড়িতে একমাত্র আমি আর গণেশ ছাড়া আর কেউ জানে না রত্নহার কোথায় থাকে। গণেশ অনেক দিনের পুরনো লোক, অতএব—'

'তবু বলছি,' তাতন যেন কেমন জোর দিয়েই বলল, 'একবার দেখে রাখবেন, জিনিসটা ঠিক আছে কিনা।'

ঘরে আবছা অন্ধকার থাকলেও তাতন বেশ বুঝতে পারল, রানা চৌধুরীর মুখে কেমন যেন এক অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটল। তিনি কিছুক্ষণ তাতনকে দেখে বললেন, 'গোয়েন্দার চেলাগিরি করতে করতে মনটা বড় সন্দিগ্ধ করে তুলছ তাতন। এখন তোমার লেখাপড়ার বয়েস। এই বয়েসে ও জিনিষটা ভালো নয়। সে রকম কোনো খবর কী কোথাও পেয়েছো যে রত্নহার তার স্বস্থানে থাকবে না?'

কিছুক্ষণ আগে পাওয়া চিঠির কথা চেপে গিয়ে তাতন বলল, 'নাহ্, তা নয়, তবে মনে হ'ল তাই বললাম।'

'তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পার। ঠিক দিনেই রত্নহার মায়ের গলায় উঠবে।'

রানা চৌধুরী প্রসঙ্গ পাল্টালেন, 'তোমাদের সেই বন্ধুটি কোথায়? তার সঙ্গে তো একবারও দেখা হ'ল না।'

শুভ্র মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বলল, 'সকালে আমরা তিনজনে একসঙ্গে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু ও যে কোথায় গেল—এখনো ফেরেনি।'

'সে কী! গণেশ জানে?'

'না। গণেশ দাদুকেও দেখতে পাচ্ছি না।'

'দেখ দেখ, গণেশকে দেখ। ও খোঁজ নিয়ে দেখুক। নইলে বলাইকে পাঠাক। পথ-ঘাট চেনে না, কোথায় বলতে কোথায় ঘুরছে—'

'হ্যাঁ, তাই দেখছি।' বলে শুভ্র আর তাতন উঠে পড়ল। হঠাৎ পালঙ্কের নিচে কী একটা সাদা মতন জিনিস দেখে তাতন বলে উঠল, 'দাদু, আপনাদের ফেভিকলের টিউবটা খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। ঐ অবস্থায় থাকলে কিন্তু আঠাটা শুকিয়ে যাবে।'

রানা চৌধুরীর ভূটা আবার কুঁচকে গেল, 'ফেভিকল? কিসের ফেভিকল?'

তাতন নিচু হয়ে পালঙ্কের তলা থেকে অর্ধেক শেষ হয়ে যাওয়া ফেভিকলের টিউবটা বার করে আনল। কিন্তু টিপতে গিয়েই বুঝতে পারল ভেতরের পদার্থটি শক্ত হয়ে গেছে।

'নাঃ, যা ভেবেছিলাম তাই। আঠাটা শক্ত হয়ে গেছে। এ আর কোনো কাজে লাগবে না।'

'ফেভিকল আবার এল কোত্থেকে? নাঃ, গণেশটাকে নিয়ে আর পারা গেল না। রেখে দাও টেবিলের ওপর। বলাই এসে ফেলে দেবেখন।'

টিউবটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে তাতন আর শুভ্র ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

॥ আট ॥

শেষ পর্যন্ত বুম্বা ফিরল ঠিক তিনটের সময়ে। হন্তদন্ত। চুল উস্কোখুস্কো। চোখে-মুখে একটা চাপা উত্তেজনা। তাতন আর শুভ্র কিছু বলতে যেতেই ও ইশারায় ওদের থামিয়ে দিলে বলল, 'এখন কোনো প্রশ্ন নয়, তোদের খাওয়া হয়ে গেছে?'

বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে শুভ্র বলল, 'বললি বটে! তুই সকাল থেকে নিখোঁজ, আর আমরা মৌজ করে খেয়ে বসে থাকব?'

'ঠিক আছে, এক দৌড়ে চান করে আসি। এই ঘরেই আমাদের খাবার দিতে বল।' বলেই ও বাথরুমে চলে গেল।

ঠিক পনেরো মিনিটের মধ্যেই ও স্নান করে এল। ইতিমধ্যে গতকালের সেই মেয়েটি এসে খাবার দিয়ে গিয়েছিল। গণেশ হালদারও একবার এসে বুম্বার খোঁজ নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে চলে গেছে। দরজাটা ভালভাবে বন্ধ করে দিয়ে এসে বুম্বা খেতে বসল ওদের সঙ্গে। শুভ্রই প্রথম কথা বলল, 'তোর ব্যাপারটা কী বলতো? বেশ ঢিমেতালে হেঁয়ালি পাকাতে শুরু করেছিস।'

বুম্বা কিন্তু সে-কথার জবাব না দিয়ে হঠাৎ একটা অন্য প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা

শুভ্র, তোর দাদুর ফ্যামিলিতে নামের আদ্যক্ষর 'র' কার আছে তুই জানিস?'

'র'? কেন বলতো?

'পরে বলব। তুই আগে উত্তর দে।'

'বড় দাদু রাঘবেন্দ্র।'

'হবে না।' বাধা দিল বুম্বা, 'রা' নয়, 'র'।'

'মেজো দাদু রবীন্দ্র। ছোট দাদু রমেন্দ্র, বড় মামা রথীন্দ্র মেজো মামা রজতেন্দ্র, ছোট মামা রণেন্দ্র। সবার নামই তো 'র' দিয়ে শুরু।'

'তাহলে, জিনিসটা কার? সবার তো হ'তে পারে না।'

এঁচোড়ের চপে কামড় দিতে-দিতে তাতন বলল, 'ব্যাপারটা কী? কী জিনিস?'

'একটা আংটি। সোনার আংটি। সোনার ওপর লাল মীনে দিয়ে লেখা আছে 'র'। বাংলায়। কুড়িয়ে পেয়েছি।'

'কুড়িয়ে পেয়েছিস? কোত্থেকে?'

'শুনলে তোদের গাঁজাখুরি বা রূপকথার গল্প মনে হবে। কিন্তু সারাটা সকাল আমার ঐ রূপকথার ল্যান্ডেই কেটে গেছে।'

'কী রকম?' তাতনের চোখে-মুখে বেশ কৌতূহলের ছটা।

'সকালে বাগানের মধ্যে তোরা তো পিছিয়ে পড়লি। আর আমি তখন গাছের ডাল ধরার জন্যে হাইজাম্প করছি। করতে-করতে হঠাৎ মন্দিরের কাছে চলে গেলাম। কী জানি কি মনে হ'ল, মন্দিরটা একবার পাক খেলাম। তোরাও নিশ্চয় লক্ষ্য করেছিস মন্দিরের চারপাশ বটগাছের ঝুরি নেমে এমন আলো-অন্ধকার আর নির্জন করে দিয়েছে যে, একা-একা হাঁটতে গা ছমছম করে। তবে আমার ওসব ভয়-টয় নেই। একটা পাক খেয়ে এসে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। ফাঁকা মন্দির। কয়েকদিন আগেই বোধ হয় চুনকাম করা হয়েছে। নতুন চুনের গন্ধ। বাইরে থেকে পোড়ো মনে হলেও ভেতরটা কিন্তু অতটা নয়। মাটি থেকে দেয়ালের অর্ধেক হলদে হয়ে যাওয়া সাদা পাথর। পাথরের বেদীর ওপরই বিরাট রুপোর সিংহাসন। তার ওপর কালীঠাকুরের মূর্তি।

'যাই বলিস না কেন, ঠাকুর দেবতায় আমার কোনোদিনও তেমন বিশ্বাস বা ভক্তি নেই। কিন্তু, চৌধুরীবাড়ির কালীঠাকুরের মধ্যে কী যেন একটা আকর্ষণ আছে। বেশ কিছুক্ষণ মূর্তির দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে ছিলাম। যে শিল্পী মূর্তিটা বানিয়েছিলেন নিশ্চয় তিনি জাতশিল্পী। নইলে ঐ রকম শক্ত পাথর কেটে মূর্তি বানানো সহজ ব্যাপার নয়।'

শুভ্র একটু যেন অধৈর্য। ও বলে উঠল, 'আহ্ বুম্বা, ডোন্ট বি সো ন্যারেটিভ। সংক্ষেপে বল।'

'সংক্ষেপ করা যাবে না, তারপর শোন্, মূর্তিটা দেখতে-দেখতে হঠাৎ মনে হ'ল, কে যেন কথা বলে উঠল।'

'কে?'

'সেটা এখনও জানি না। কিন্তু মনে হ'ল, একটা মানুষ যেন অনেক দূর থেকে কিছু বলছে। শব্দটা চাপা আর অস্পষ্ট। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। কিন্তু কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না। আবার কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আবার সেই রকম মানুষের গলা। যেন অনেক দূর থেকে কে কী বলছে।'

তাতন ফস্ করে বলে উঠল, 'অনেকটা ভেন্ট্রিলুকোইজ্ম-এর মতো। তাই না?'

'ভেনট্রিলুকোইজ্ম মানে সেই ম্যাজিকের খেলা তো? বলতে পারিস, অনেকটা সেইরকমই শোনাচ্ছিল। অন্য কেউ হলে ভূতটুত ভেবে নিয়ে পালাত। কিন্তু বুম্বা মুখার্জী ডাজ নট বিলিভ ইন ঘোস্ট। অনেকক্ষণ ধরে ব্যাপারটা আঁচ করার চেষ্টা করতে লাগলাম।'

'আচ্ছা', আবার তাতন বাধা দিল, 'আওয়াজটা কী পুরুষের গলার?'

'হ্যাঁ, ডেফিনিটলি পুরুষের গলা। কারণ, একবার মনে হয়েছিল হয়তো অনেক দূর থেকে উমা পাগ্‌লা চিৎকার করছে। কিন্তু উমা পাগ্‌লা নয় এই কারণে যে, আগেই বলেছি, শব্দটা খুব চাপা আর অস্পষ্ট। মনে কর, একটা মুখচাপা বিরাট জালার মধ্যে বসে কেউ যদি চিৎকার করে তাহলে যে রকম আওয়াজ বের হয়, এটা অনেকটা সেই রকম।'

'আওয়াজটা কী কনটিনুয়াস হচ্ছিল, না, থেমে থেমে?'

'থেমে থেমে।'

'কথাটা কী?' তাতন গোয়েন্দার মতো জেরা শুরু করেছে।

'তা কিছুতেই ধরতে পারিনি। তারপর শোন্, একবার মনে হলো শব্দটা বুঝি দেওয়াল ভেদ করে আসছে। চার দেয়ালে কান পাতলাম। দেয়ালগুলো ঠুকে ঠুকে দেখলাম। নিরেট পাথরে তৈরি। তার ওপর প্রায় একহাত চওড়া দেয়ালের ওপাশে তো ফাঁকা বাগান। এইভাবে কতক্ষণ কেটেছিল জানি না। শব্দটাও থেমে গিয়েছিল। 'দুর ছাই' বলে ফিরেও আসছিলাম। হঠাৎ মূর্তির পিছনে, সিংহাসনের নিচেই, একটা চকচকে জিনিস দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কাছে গিয়ে দেখি, পড়ে আছে এই আংটিটা।' বলে বুম্বা বাঁ হাত দিয়ে ওর পকেট থেকে বার করল একটা সোনার আংটি। তাতে লাল মীনে দিয়ে লেখা 'র'। জ্বলজ্বল করছে।'

'তারপর?' শুভ্র আর তাতন, দু'জনেই বুম্বার কথা গিলছিল।

'ভাগ্যিস তোদের মন্দিরে লোকজনের যাতায়াত নেই, নইলে...

'নইলে ফইলে ছাড়। তারপর কী হ'ল বল—'

'নইলে ছাড়া চলবেনা। একটা অদ্ভুত, মানে আলিবাবার গল্পে যা পড়েছি তা দেখা হ'ত না। আংটি হাতে নিয়ে যখন ভাবছি, কী ব্যাপার, চকচকে একটা আংটি তো এখানে পড়ে থাকার কথা নয়। তার ওপর রিসেন্টলি ঘর হোয়াইট ওয়াশ করা হয়েছে। তবে কী হোয়াইট ওয়াশ হবার পর পূজাবি ছাড়াও অন্য কেউ এসেছিল? এই রকম সাত-পাঁচ ভাবছি, এমন সময়, তুই বিশ্বাস কর তাতন, আমার হঠাৎ মনে হ'ল, সিংহাসনটা যেন দুলে উঠল।'

শুভ্রই বলল, 'কী বলছিস পাগলের মত!'

'পাগল নই, পরে প্রমাণ করে দোব। তারপর কি হ'ল শোন্। একবার দুলে উঠেই সিংহাসন স্থির হয়ে গেল। কিন্তু বেশ বুঝতে পারলাম সিংহাসনটা ঈষৎ বেঁকে গেছে। সত্যি বলতে কী, ঐ সময় আমি একটু ভয়ও পেয়েছিলাম। এরকম অলৌকিক কাণ্ড তো এর আগে কোনোদিন দেখিনি। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে ভাবলাম, ভূত বা অলৌকিক বলে কিছু নেই। থাকতে পারেনা। তাহলে এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটা কী?'

বুম্বা বোধ হয় কথা গুছিয়ে নিতে চাইছিল। একটু থেমে ও আবার শুরু করল, 'অনেক সময় আমরা গোয়েন্দা গল্পের বই বা সিনেমায় দেখেছি বোতাম টিপলেই দরজা সরে যায়। তবে কী এখানেও সেরকম কিছু আছে? তোরাও দেখেছিস মন্দিরের মেঝেটা শ্বেত পাথরের তৈরি। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সে জায়গাটায় বেশ কিছুক্ষণ লাফালাম। এদিক-ওদিক নাড়িয়ে দেখলাম। কিন্তু সিংহাসন নট নড়ন-চড়ন। হঠাৎ একটা কথা মাথায় ফ্ল্যাশ্ করল। তোদের বলতে ভুলে গেছি, আংটিটা নেবার সময় একটা ঘটনা ঘটেছিল। তাড়াহুড়ো ক'রে আংটিটা নিতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছিলাম। হাতটা সজোরে পড়েছিল সিংহাসনের নিচের মেঝেতে। তবে কী ওখানেই কিছু গোপন বোতাম-টোতাম আছে? কথাটা মনে হতেই সিংহাসনের নিচেটা দু'হাত দিয়ে সজোরে চাপ দিলাম। তারপর...তোদের বলব কী, গা হাত পা আমার শিরশির করে উঠল। বিংশ শতাব্দীর শেষে এসে কলকাতা থেকে কিছু দূরে এক ভাঙা আর পোড়ো মন্দিরে বসে চিচিং ফাঁক-এর খেলা দেখলাম। ধীরে ধীরে সিংহাসনটা কালী মূর্তি সমেত বাঁদিকে ঘুরতে আরম্ভ করল। একদম অ্যাবাউট টার্ন করে যখন সিংহাসনটা থেমে গেল, দেখলাম চৌকো একটা গর্ত খাঁ খাঁ করছে। অন্ততঃ চারজন মানুষ সেই গর্তটার মধ্যে ঢুকে যেতে পারবে।'

শুধু শুভ্র নয়, তাতনও চাট্নি খাওয়া থামিয়ে স্থির হয়ে বসল। ওরাও কল্পনা করতে পারেনি এরকম একটা দারুণ রহস্যময় অ্যাড্ভেঞ্চার করে বুম্বা ফিরে এসেছে।

তাতন তাড়া লাগাল, 'নে নে, থামিস না, এ রকম একটা জায়গায় এসে থামার কোনো অর্থই হয় না।'

বুম্বা আধ গ্লাস জল খেয়ে শুরু করল, 'ঐ সময় একবার মনে হয়েছিল তোদেরকে নিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা দেখাই। কিন্তু তোদের ডাকতে যাবার মতো পরিবেশ ছিল না। ধীরে ধীরে আমি সেই গর্তটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু ভেতরটা এত অন্ধকার, তার ওপর সঙ্গে কোনো টর্চও ছিল না। রিস্ক নেওয়া উচিত হবে কিনা তাও ভাবছিলাম। তোরা তো জানিস ভয়ডর আমার একটু কম। শেষ পর্যন্ত ভেতরের উত্তেজনা কিছুতেই চেপে রাখতে না পেরে কপালে যা আছে তাই হবে এই ভেবে গর্তের মধ্যে পা দিলাম। পেলাম একটা ধাপ। সিঁড়ির ধাপ। অর্থাৎ একটা সিঁড়ি নিচের দিকে নেমে গেছে। তার মানে নিচে নিশ্চয় কিছু আছে।

'চারপাশে নিরেট দেওয়াল। ধাপের পর ধাপ সিঁড়ি নেমে গেছে। নেমে গেলাম। আন্দাজে।'

হঠাৎ শুভ্র বলল, 'বাপরে! তোর সাহস আছে। আমি হলে কিছুতেই নামতাম না।'

'সবে তো শুরু, তারপর কী হ'ল শোন্। কতক্ষণ নেমেছি মনে নেই। নামছি তো নামছি—তার ওপর যত নিচে যাচ্ছি অন্ধকারও তত গাঢ় হয়ে উঠছে। শেষকালে তো আর কিছু দেখাই যাচ্ছিল না। হাতড়ে হাতড়ে কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ একটা শক্ত দেয়ালে খেলাম ধাক্কা। বুঝলাম এলাকাটা ওখানেই শেষ। কোনদিকে যাব, কোথায় এলাম, কিছুই তখন আর ভেবে উঠতে পারছিলাম না। ডানদিকে খানিকটা এগিয়ে গেলাম। আবার দেয়ালে ধাক্কা। দেয়ালে হাত রেখে-রেখে আরো কিছুটা এগিয়ে গিয়ে আবার দেয়ালে ধাক্কা খেলাম। বুঝলাম, সব দিকেই রাস্তা ব্লক। সত্যি বলতে কী জ্ঞান হবার পর এই প্রথম আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ঝোঁকের মাথায় নেমে এসেছি, এখন যদি রাস্তা খুঁজে না পাই তাহলে হয়ত আর কোনোদিনই ঐ পাতাল থেকে বেরুতে পারব না। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভয়টা কাটিয়ে উঠলাম। কারণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভয় পেয়ে মরার থেকে চেষ্টা করে দেখা ভাল। এক হাতে দেয়াল টার্গেট করে এগিয়ে চললাম। কারণ কোথাও-না-কোথাও দেয়াল তো শেষ হবেই। নইলে বুঝতে হবে ওটা একটা চৌকো ঘর। তাহলে নামার সিঁড়িটাও একসময়ে পেয়ে যাব। এগুচ্ছি, হঠাৎ সেই চাপা শব্দটা কানে এসে লাগল। আগের মতো চাপা না হলেও স্পষ্ট নয়। এবং কী বলছে তাও বোঝা যায় না। কিন্তু মনে হচ্ছিল কে যেন প্রাণপণে চিৎকার করছে। দেয়ালে কান পাতলাম। মনে হ'ল যেন দেয়ালের ওপাশ থেকে কেউ কিছু বলছে। চেঁচিয়ে জিগ্যেস করলাম, কে? কে কথা বলছ? কিন্তু কোনো সাড়া পেলাম না।

'তারপর এক সময় হাল ছেড়ে দিয়ে, কী করব বল, আমার তো কিছু করার ছিল না, স্যাঁতসেঁতে নোংরা জায়গা, পায়ের তলায় ভিজে মাটি আর পাথর মাড়িয়ে ডিঙিয়ে এগুতে-এগুতে হঠাৎ মনে হ'ল যেন অন্ধকারটা ফিকে হয়ে আসছে। পায়ের নিচে ক্রমশঃ মাটি ঘাস হয়ে উঠছে। তখন আর দেয়াল ছিল না। কারণ এক সময় দেয়ালটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। তার বদলে ঝোপ-ঝাড় গাছপালা বাড়তে লাগল। এমনি করে বেশ কিছুক্ষণ চলার পর এক সময় আলো দেখতে পেলাম। গভীর জঙ্গল আর বড় বড় গাছের মাথা ভেদ করে সূর্যের আলো এসে মাটিতে পড়েছে। প্রাণের ভয় তখন আর ছিল না, কিন্তু যখন পরিপূর্ণ সূর্যের আলোর নিচে এসে দাঁড়ালাম তখন বুঝতে পারলাম আমি একটা জঙ্গলের সীমানায় দাঁড়িয়ে। আর জায়গাটা আমার সম্পূর্ণ অচেনা। অবশ্য অনেক দূরে জনবসতি চোখে পড়ছিল। তাড়াতাড়ি পা চালালাম। কারণ হাতঘড়ির দিকে নজর দিতেই দেখি বেলা একটা। তার মানে, চার ঘন্টা আমি একটা অদ্ভুত জায়গায় ঘুরেছি।'

বুম্বা ওর কাহিনী শেষ করে থামল। কিন্তু তাতন থামল না। বলল, 'কিন্তু তুই বাড়ি ফিরলি কী করে?

'সাইকেল রিক্সায়। লোকালিটির মধ্যে ফিরে এসে একজনকে জিগ্যেস করলাম, ময়নাডাঙ্গা কতদূর? সে বলল, এখান থেকে ময়নাডাঙ্গা প্রায় দু-ক্রোশ। অগত্যা সাইকেল রিক্সা অ্যান্ড ব্যাক টু দ্য প্যাভিলিয়ন।'

খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। হাতটাত ধুয়ে এসে শুভ্র বলল, 'সত্যি তুই ডানপিটে। দেখালি বটে। ভাগ্যিস সাপ-খোপে কাটেনি তোকে!'

কিন্তু তাতন অত হাল্কাভাবে ব্যাপারটা ছেড়ে দিল না, বলল, 'তা না হয় হ'ল, কিন্তু মন্দির? সিংহাসন? ওটা কী এখনও ঐভাবে?'

'বড় আশ্চর্য ব্যাপার,' বুম্বা বলল, 'ময়নাডাঙ্গায় রিক্সা ছেড়ে আমি প্রথমেই ছুটে গেছি মন্দিরে, এবং গিয়ে দেখি সিংহাসন পূর্ববৎ।'

'তার মানে?'

'জানি না। সিংহাসন কী আপনা-আপনি নিজের জায়গায় ফিরে এসেছে, নাকি এ ব্যাপারটা জানে এমন কেউ দেখতে পেয়ে সিংহাসন আবার ঠিক করে রেখেছে তা বলতে পারব না।'

'তোকে কেউ দেখেছে?'

'কোথায়? নিচে? আমার তো মনে হয় না। তবে সবই ঘোলাটে ব্যাপার, আড়াল থেকে কেউ দেখেছে কিনা বলতে পারব না।'

'হুঁ, সব মিলিয়ে একটা দারুণ অ্যাডভেঞ্চারাস রহস্য,' তাতন ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল।

বুম্বা বলল, 'তুই তো তাই-ই চেয়েছিলি।'

'হ্যাঁ—চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন ঘটনাটা কী দাঁড়াল? ট্রেনের রহস্যময় আগন্তুক আমাদের সর্বদা ফলো করছে। আজ একটা জব্বর ধাঁধা পাঠিয়েছে। তার বক্তব্য সামনে রহস্য এবং বিপদের কারণ রয়েছে। উমা পাগ্‌লা, মিস্‌টিক ক্যারেকটার। পুরনো মন্দিরে তুই আবিষ্কার করলি সুড়ঙ্গপথ। সে-পথ এক গ্রাম ছাড়িয়ে অন্য গ্রামের জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে। পেলি একটা আংটি। তাতে লেখা 'র'। 'র' দিয়ে এ-বংশের লিডিং পাঁচজনের নাম পাওয়া যাচ্ছে। তার মধ্যে একজন কলকাতায়, একজন এখানে, আর দু'জন ভারতবর্ষের বাইরে। আবার ট্রেনের রহস্যময় লোকটির হাতেও 'র'-এর উল্কি। তাহলে কী সব কিছুর মধ্যে কোথাও অদৃশ্য যোগাযোগ রয়েছে?'

'কিন্তু', শুভ্র বলল, 'ট্রেনের লোকটাকে তুই বললি চিনতে পেরেছিস?'

'চিনতে পেরেছি বলিনি। বলেছি, কোথায় যেন দেখেছি। এখন সব গুলিয়ে যাচ্ছে ঐ 'র'-এর জন্যে। নে ধাঁধাটা দেখতো, যদি কিছু মানে বুঝতে পারিস।'

বুম্বা কাগজটায় একবার চোখ বুলিয়ে ফেরৎ দিতে-দিতে বলল, 'ধাঁধাটাঁধা আমার মাথায় ঢোকে না। কিন্তু একটা জিনিস আমি বলতে পারি, ঘটনা যতই রহস্যময় হোক, বা এর মধ্যে কোনো চক্রান্ত থাক, তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। এ নিয়ে মাথা ঘামাবারও কোনো কারণ থাকতে পারে না। তাছাড়া ডাইরেক্ট কোনো ক্রাইম কী ঘটেছে?'

'না, তা অবশ্য ঘটেনি। কিন্তু—'

'তাহলে চেপে যা, খুব টায়ার্ড। বলেই বুম্বা বিছানায় গা এলিয়ে দিল।

॥ নয় ॥

কিন্তু চেপে যাওয়া আর গেল না। শেষ পর্যন্ত ক্রাইম একটা হ'ল। মার্ডার। সে-রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়লেও তাতন ঘুমতে পারেনি। জানলা থেকে দূরের মন্দিরটা ওকে বার বার টানছিল। বার বার মনে হচ্ছিল একবার মন্দিরটায় গিয়ে দেখলে হ'ত। কিন্তু যাবার উপায় ছিল না। কারণ, বারান্দার দরজা বন্ধ। রাত্রে অবশ্য গত রাতের মতো বারান্দায় আর কাউকে পায়চারি করতে দেখেনি। অবশেষে সকালের ধাঁধার কথা চিন্তা করতে-করতে এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙল বাড়ির লোকজন আর গণেশ হালদারের চিৎকার-চেঁচামেচিতে। বড়কর্তার ঘর থেকেও আওয়াজ আসছিল, 'এসব কী! পুজোর আগে কী সব বিশ্রী কাণ্ড!' ইত্যাদি।

তিনজনেই বাইরে এসে দেখে গণেশ হালদার হন্তদন্ত হয়ে নিচে নামছে। শুভ্র ওকে থামাল, কী হয়েছে গণেশ দাদু? এত হৈ-চৈ, ও-ঘর থেকে দাদুও

চেঁচাচ্ছেন—'

'সর্বনাশ হয়ে গেছে ভাই। উমা পাগ্‌লাকে কে খুন করেছে।'

'খুন?'

'হ্যাঁ, খুন ছাড়া আর কী বলব? গলার নলিটা দু-টুকরো ক'রে কে যেন কুপিয়ে দিয়েছে।'

'কোথায় হয়েছে ঘটনাটা?' এবার তাতনই জিজ্ঞাসা করল।

'ওই, ন্যাড়াবুড়ীর জঙ্গলের ঠিক সামনে। তোমরা যেন আর বাড়ি থেকে বেরিও না। এক্ষুনি পুলিস আসবে। শুরু হবে নানান ঝামেলা।'

শুভ্র বলল, 'কিন্তু দাদু চেঁচামেচি করছেন কেন? ওর শরীরের এই অবস্থা। ডাক্তারের বারণ।'

'কে শোনে কার কথা! আসলে উমানাথ পাগল হলেও এখনও এ বাড়ির আশ্রিত। তাই পুলিসের ঝামেলাও এ বাড়িতে এসে পড়বে। কর্তাবাবু তো পুলিস-টুলিসকে দু-চোখে দেখতে পারেন না। তোমরা বরং দাদুর কাছে গিয়ে বস।' বলেই গণেশ হালদার ক্ষিপ্রগতিতে নিচে নেমে গেল।

'হ'ল তো?' বলে বুম্বা ফিরে তাকাল তাতনের দিকে, 'রহস্য, মার্ডার, চুরি এসব না হলে তো তোর ছুটির মেজাজ হচ্ছিল না। নে, এবার উমা পাগ্‌লার হত্যারহস্য নিয়ে পড়। আমি বাবা এসবের মধ্যে নেই, আগেই বলে রাখছি।'

তাতন ওর ঠাট্টা গায়ে না মেখে বলল, 'মিস্টার র ক্রমশঃই আমার কাছে বেশ সন্দেহজনক হয়ে উঠছে। লোকটার দেখা না পেলে তো আর চলছে না।'

'তুই আবার এর মধ্যে মিস্টার র-কে ঢুকিয়ে দিলি?' বুম্বাই বলল কথাটা।

'দোব না? ওর সব কথা যে অক্ষরে-অক্ষরে ফলে যাচ্ছে। উমা পাগ্‌লাকে লক্ষ্য রাখতে বলেছিল—রাখা হয়নি। সেই উমা পাগ্‌লা মার্ডার হ'ল। বাট হোয়াই? আমার মনে হয় মোটিভ্ একটাই। ও অনেক কিছু জানত। পাছে সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাই এই হত্যাকাণ্ড। কিন্তু সে কী জানত সেটাই জানা হ'ল না।' তাতন আফসোসে ভেঙে পড়ল, 'এ রকম আইড্‌ল্ অ্যান্ড নেগলেকটিং মেন্টালিটি নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করা যায় না।'

'দোহাই বাবা, তোকে আর গোয়েন্দাগিরি করতে হবে না।' বুম্বা তাতনকে বাধা দিল, 'ও সব তোর আমার কাজ নয়। পুলিস এসে যা করার করুক। এখন চ, দাদুর কাছে একটু যাওয়া যাক। আমি তো ভদ্রলোককে এখনও চোখেই দেখিনি।'

'তোরা যা।' বলেই তাতন ধপ্‌ধপ্ করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করে দিল।

'এই তাতন—'

'তোদের আসতে হবে না। আমি একটু স্পট্‌টা দেখে আসি।' বলেই ও ছুটেই

বেরিয়ে গেল।

শুভ্র একবার বুম্বার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা আমারও খুব একটা ভালো ঠেকছে না রে। বেশ গোলমেলে মনে হচ্ছে। চ আমরাও যাই।'

'তুইও তাহলে গোয়েন্দা হতে চাস?'

'গোয়েন্দা-টোয়েন্দা বুঝি না। আফটার অল কেসটা আমাদের চৌধুরী পরিবারের মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছে। সত্যিই যদি এর মধ্যে কোনো রহস্য থাকে, তাতন শেষ না দেখে ছাড়বে না। তাই আমাদেরও উচিত তাতনের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো।'

'বাহ্ ভাই, বাহ্! এই তোর কালীঠাকুরের রত্নহার দেখানো! ঠিক আছে চল, তাহলে আমিও আছি। নাউ টিন-এজার গোয়েন্দার দল, লেট্স্ মুভ্ অন।'

ওরা যখন স্পটে গিয়ে পৌঁছল সেখানে তখন একটা ছোটখাটো জটলা। অধিকাংশই চাষা-ভুষো। আর রগড় দেখার তাল। তখনও পুলিস এসে পৌঁছয়নি। গণেশ হালদারকে দেখা গেল না। তাতন মনোযোগ দিয়ে একদৃষ্টে মৃত উমা পাগ্লাকে দেখছে। দৃশ্যটি যে খুব বীভৎস তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মৃতদেহ প্রায় উপুড় হয়ে একটা বড় পাথরের সঙ্গে লেপ্টে আছে। ডান হাত বুকের সঙ্গে সাঁটা। বাঁ হাতটা মুঠিবদ্ধ। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মুখটা অল্প ফাঁক। রক্তাক্ত জিভটা দেখা যাচ্ছে। গলার নলিটা ছিন্নভিন্ন। শুভ্র আর বুম্বা এগিয়ে গিয়ে তাতনের পাশে দাঁড়ালো। একটু পরে বুম্বা বলল, 'এঃ, একেবারে মুরগিকাটার মতো পেঁচিয়ে দিয়েছে। টোট্যালি ইনহিউম্যান ব্যাপার।'

তাতন মুচ্‌কি হেসে বলল, 'সব মার্ডারই ইনহিউম্যান। কিন্তু একটা মজার জিনিস লক্ষ্য করেছিস?'

'কী?'

'মৃতদেহ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মনে হয় পিছন থেকে মার্ডার করা হয়েছে। সাধারণতঃ এই রকম ধারালো অস্ত্র দিয়ে মার্ডার করার সময় পিছন থেকেই করে—'

'এও হতে পারে', বুম্বা বিজ্ঞের মতো বলল, 'হয়ত সামনের দিক থেকেই খুনি গলাটা কেটে দিয়েছিল, মরবার সময় লোকটা উপুড় হয়ে গেছে।'

'উহুঁ, তা মনে হয় না, সামনের দিক থেকে ঐভাবে গলা কাটা খুনির পক্ষে একটু শক্ত কাজ হয়ে যায়। যদি ধরে নিই যে তাই হয়েছে, তাহলে চিৎ হয়ে পড়তো। কিন্তু লোকটা উপুড় হয়ে আড়াআড়ি পড়ে আছে। চোখ আর মুখ দেখ্, বেশ ভয়ের চিহ্ন। হতে পারে, লোকটা মরার আগে জানতে পেরেছিল তাকে হত্যা করা হচ্ছে। বাঁচবার জন্যে চেচাঁতে চেয়েছিল, পারেনি। মুখটা হাঁ অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু অস্ত্রটা গেল কোথায়?'

'এসব খুনিরা কী আর অস্ত্র ফেলে যাবে?'

'কিন্তু ওর হাতটা মুঠো করা কেন? কী ধরে আছে? বুম্বা, শুভ্র, তোরা এই জনতাকে একটু ম্যানেজ করতো, পুলিস আসার আগে আমি একটু ওর হাতটা দেখে নিই।'

'বডিতে হাত লাগাস না যেন।' শুভ্র তাতনকে সাবধান করে দিল।

তাতন যথাসম্ভব দূরত্ব বজায় রেখেই মৃতদেহের মুঠো করা হাতটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল। ওর মুখে আর চোখে কুঞ্চন রেখা ফুটে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে ফিরে এসে বলল, 'চ এবার ফেরা যাক।'

'হয়ে গেল সব দেখা?'

'সব না হলেও, কিছুটা। তাছাড়া এ খুনের ব্যাপারে পুলিস যা পারে করুক, আমাদের কিছু করার নেই।'

'তার মানে?' বুম্বা বেশ বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল।

'মানে, উমা পাগ্‌লা ইজ নট আ ফ্যাক্টর। ওকে মার্ডার করার রহস্য অন্য জায়গায়। আমাদের লক্ষ্য সেই মূল জায়গাটা।'

'অর্থাৎ তুই বলতে চাইছিস ওকে হত্যা করার মূল কারণটা বার করার জন্যে আমাদের অন্য জায়গায় খুঁজতে হবে? এখানে থাকার কোনো প্রয়োজনই নেই?'

'ইয়েস, শুভ্র চৌধুরী, আমি সেই কথাই বলতে চাইছি। এই হত্যাকাণ্ড একটা গভীর রহস্যের বাইপ্রোডাক্ট ছাড়া আর কিছু নয়।'

'তাহলে এখন কোথায় যাওয়া যায়?'

'মন্দিরে যাবার ইচ্ছে ছিল। তবে আপাততঃ বাড়ি। কারণ, আমার অনুমানমতো মিস্টার 'র'-এর কাছ থেকে একটা চিঠি পাবার সময় হয়ে গেছে।'

॥ দশ ॥

বাড়ি ফিরে অবশ্য তাতনরা কোনো চিঠি খোঁজার অবসর পেল না। তার আগেই যা শুনল তা রীতিমতো সাংঘাতিক। ওরা তখন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিল। গণেশ হালদার সিঁড়ি দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে নামছে। গণেশ হালদারকে দেখেই তাতনের ভ্রূ কুঁচকে উঠল। প্রায় আপনমনেই বলে উঠল, 'ভারি আশ্চর্য! গণেশ দাদু তো পুলিসে খবর দিতে গিয়েছিল, তাহলে...'

ওদের উঠতে দেখেও গণেশ হালদার না থেমেই পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল। থামালো তাতনই, বলল, 'কী ব্যাপার গণেশ দাদু, এতো তাড়াহুড়ো করে কোথায় যাচ্ছেন?'

'আর বোলো না ভায়ারা, সব্বোনাশ হয়ে গেছে। একেই বলে বিপদ যখন আসে একা আসে না।'

'আবার কী বিপদ হ'ল?'

'মা কালীর রত্নহার চুরি গেছে।'

'অ্যাঁ!' শুভ্র যেন আৎকে উঠল, 'কী বলছেন গণেশ দাদু?'

'যাও, ওপরে গিয়ে দেখ, তোমার দাদু কপাল চাপড়াচ্ছেন।'

গণেশ হালদার নিচে নামতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তাতন ওকে বাধা দিল, 'কিন্তু আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

গণেশ হালদার বলল, 'আমি, মানে, পুলিস—পুলিসে খবর দিতে। কর্তাবাবু বললেন পুলিস ডাকতে।'

'কিন্তু আপনি তো একটু আগে উমা পাগ্‌লার খুনের জন্যে পুলিসে খবর দিতে গিয়েছিলেন—'

আচমকা এরকম একটা প্রশ্নে গণেশ হালদার সামান্য থতমত খেল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে পরক্ষণেই বলল, 'তাই তো যাচ্ছিলুম, কিন্তু কর্তা ডেকে পাঠালেন, এখানে চলে আসতে হ'ল, এসে শুনি—। নাহ্ , আমি চলি।' বলেই গণেশ হালদার পাঁই পাঁই করে নিচে নেমে গেল।

ওপরে দাদুর ঘরে এসে দেখল, রানা চৌধুরী তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে চোখ ঢেকে শুয়ে আছেন। পদশব্দে হাত সরিয়ে ওদের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'শুনেছ নিশ্চয় তোমরা?'

'হ্যাঁ,' শুভ্রই বলল, 'গণেশ দাদুর মুখে শুনলাম।'

কথা টেনে-টেনে রানা চৌধুরী বললেন, 'এ বংশের সবই গেছে একে-একে। শেষ সৌভাগ্য-লক্ষ্মীটুকুও চলে গেল। পারলাম না চৌধুরীদের সম্মান বাঁচিয়ে রাখতে।'

হতাশায় ফের ডুবে গিয়ে হাত দিয়ে মুখ ঢাকা দিলেন। শুভ্র আর বুম্বা মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের মুখে কথা সরছিল না। বেশ বুঝতে পারা যায়, রত্নহার হারিয়ে রানা চৌধুরী একেবারে ভেঙে পড়েছেন। একটু সময় নিয়ে তাতনই প্রশ্ন করল, আপনি ভাল করে দেখেছিলেন গুপ্ত সিন্দুকটা?'

'একবার নয়, বার বার। ফাঁকা সিন্দুক দেখেও তন্ন তন্ন করে ফাঁকা জায়গায় হাত দিয়ে দেখেছি।'

'কিন্তু চুরি গেছে এ সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিত হচ্ছেন কেমন করে?'

'তুমি কী বলতে চাইছ হে ছোকরা?' বেশ রাগতস্বরেই রানা চৌধুরী বললেন, 'আমি কী মস্করা করছি? আর ক'টা দিন পরেই আমাদের কালী মায়ের পুজো—'

'না, মানে', তাতন ওঁকে বাধা দিল, 'মানে, আমি বলতে চাইছিলাম, আপনিই হয়ত মনের ভুলে—'

'তা কখনো হতে পারে না। রত্নহার তার নির্দিষ্ট সিন্দুক ছাড়া আজ পর্যন্ত

অন্য কোথাও রাখা হয়নি।'

'কিন্তু চাবি নিশ্চয় আপনার কাছে ছিল বা আছে?'

'ওই, ওই,' শ্বেত পাথরের টেবিলে রুপোর চেনে মাত্র একটাই চাবি পড়ে ছিল, 'ওই সেই চাবি। ওর আর কোনো প্রয়োজনই নেই এখন।'

'চাবিটা কোথায় থাকত?'

'গোয়েন্দাগিরি করতে চাও?'

'আপনি যদি অনুমতি দেন।'

'পারবে খুঁজে বার করতে?'

'চেষ্টা করতে কী দোষ, তাতে আপনার লাভ বই ক্ষতি হবে না।'

'ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে, তার থেকে বড় ক্ষতির আর কিছু নেই।' তারপর কী যেন একটু চিন্তা করে বললেন, 'পারবে বলে আমার বিশ্বাস নেই, তবে দেখ চেষ্টা করে।'

'আমি যে পারবই একথা বলছি না, তবে এ ব্যাপারে আপনি যদি একটু সাহায্য করেন—'

'কী রকম?'

'কয়েকটা ইনফরমেশন।'

'জিজ্ঞাসা কর।'

আর কোনো রকম ভূমিকা না করে তাতন সরাসরি ওর প্রশ্ন শুরু করল, 'কালীপুজোর তো এখনও দিন দশ-এগারো বাকি, তা হঠাৎ আপনি আজই মুণ্ডুমালা খুঁজতে গেলেন কেন?'

'সেটা তুমিই আমাকে করতে বাধ্য করিয়েছ। কাল হঠাৎ ওরকম একটা প্রশ্ন করে আমার মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছিলে, তাই।'

'কিন্তু আপনি তো ডেফিনিট ছিলেন?'

'ছিলাম।'

'চাবি থাকত আপনার কাছে?'

'হ্যাঁ। এই তাকিয়ার নিচে।'

'ওরকম একটা প্রয়োজনীয় চাবি ওভাবে ফেলে রাখতেন কেন?'

'ওটাই তো সব থেকে নিরাপদ জায়গা। কারণ, আমি যতই ঘুমিয়ে থাকি না কেন, আমার মাথার বালিশের নিচ থেকে চাবি নেওয়া সম্ভব নয়।'

'কিন্তু ইদানীং আপনাকে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে থাকতে হ'ত, সেই ফাঁকে যদি—'

'অ্যাঁ,' বলে কয়েক মুহূর্ত তাতনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ তাতন, এখন মনে হচ্ছে সেটাই সম্ভবতঃ ঘটেছে।'

'শেষ কবে আপনি রত্নহারটা দেখেছিলেন?'

'দুগ্‌গো পুজোর সময়।'

'আপনি বলেছিলেন, আপনি আর গণেশ দাদু ছাড়া এ বাড়িতে আর কেউ—

'এখনো বলছি, আর কেউ জানে না।'

'তাহলে তো গণেশ দাদুকেই সরাসরি সন্দেহ করতে হয়।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। গণেশ? কে জানে! লোভ মানুষকে হয়ত ঠিক থাকতে দেয় না।'

'এ ব্যাপারে আপনি গণেশ দাদুকে কিছু জিগ্যেস করেছিলেন?

'না। সে সময়ও পাইনি। আমার মুখে খবর পেয়েই ও পুলিসে খবর দিতে গেছে।'

'আচ্ছা, ইদানীং আপনার ঘরে তো রাত্রে একজন লোক থাকে?'

'হ্যাঁ, সরলার ছেলে বলাই। কিন্তু ও জানবে কী করে যে, ওটা গুপ্ত সিন্দুকের চাবি? আর চাবি পেলেও গুপ্ত সিন্দুক খুঁজে পাবে না।'

'সেটা কোথায়?'

'গুপ্ত জায়গায়। তবে এখন আর তোমাদের দেখাতে ক্ষতি নেই। শুভ্র—'

শুভ্র বলল, 'হ্যাঁ, বলুন।'

'ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দাও।'

বুম্বা দরজাটা বন্ধ করে দিল। ঘরটা একেই অন্ধকার ছিল। দরজা বন্ধ করতে একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। প্রায় কিছুই চোখে দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ একটা ঘড় ঘড় শব্দ হতে ওরা সামনের দেয়ালের দিকে তাকালো। মনে হ'ল কী যেন একটা সরে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে আওয়াজটা থেমে গেল। অন্ধকারে রানা চৌধুরীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'শুভ্র এবার গিয়ে ডানদিকে শেষ সুইচ্‌টা জ্বালিয়ে দাও।'

শুভ্র তাই করল। হাল্কা নীল আলোয় ঘরটা স্বল্প আলোকিত হয়ে উঠল।

'এবার সামনের দেয়ালটা দেখ। কী দেখছ?'

তাতন বলল, 'একটা চৌকো গর্ত।'

'হ্যাঁ, ওটাই গুপ্ত সিন্দুকের খুপরি। এবার চাবি আর টেবিলের ওপর থেকে টর্চটা নিয়ে ওখানে যাও।'

টর্চ আর চাবি নিয়ে তাতন এগিয়ে গেল। গর্তের মুখে টর্চের আলো ফেলল। দেখল, দুহাত বাই দু'হাত একটা চৌকো খুপরির মধ্যে ছোট্ট একটা সিন্দুক বসানো আছে। রানা চৌধুরীর নির্দেশমতো ও গিয়ে সিন্দুক খুলল। ভেতর ফাঁকা। কিছুই

নেই।

সিন্দুক বন্ধ করে তাতন ফিরে আসতেই রানা চৌধুরী শুভ্রকে আলো নিভিয়ে দিতে বললেন। আলো নিভে যেতেই আবার সেই ঘড় ঘড় আওয়াজ। ফাঁকটা বুজে গেল।

'অতএব বুঝতেই পারছ বলাই-এর পক্ষে জায়গাটার হদিশ পাওয়া সম্ভব নয়। এখন তোমরা হাজার চেষ্টা করলেও ঠিক কোন্ জায়গায় দেয়াল সরে গিয়েছিল তা ধরতেই পারবে না। এমনি কায়দায় ওটা তৈরি।'

বুম্বা ঘরের দরজা খুলে দিয়েছিল। আলো ফিরে আসতে সবাই দেয়ালের দিকে তাকালো। সত্যিই দেয়ালটা যে একটু ফাঁক হয়েছিল তা আর বোঝাই যায় না।

তাতন আরো দু'একটা প্রশ্ন করল।

'আচ্ছা দাদু, আপনি ঠিক কখন বুঝতে পারলেন যে রত্নহার আর নেই?'

'এই একটু আগে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই শুনলাম উমাকে কে খুন করেছে। উমার মতো সরল আর পাগল-ছাগল লোককে কে খুন করল আর কেনই বা করল তা ভাবতে-ভাবতে তোমার গতকালের কথাটা মনে পড়ে গেল। যদিও ডাক্তারের বারণ তবুও আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে সিন্দুক খুলে দেখি ওটা খোয়া গেছে।'

'আপনার কী কাউকে সন্দেহ হয়?'

'আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না।'

'আর একটা প্রশ্ন, পরশু রাত্রে কী আপনি বারান্দায় পায়চারি করছিলেন?'

'পরশু রাত্রে? আমি? ঘরের মধ্যে এখান থেকে ওখানে উঠে বেড়াবার অনুমতি নেই, আর বারান্দায় করব পায়চারি? হঠাৎ এ প্রশ্ন করছ কেন?'

'পরশু রাত্রে, আই অ্যাম সিওর, আপনার বারান্দায় কেউ পায়চারি করছিল। আমি আর বুম্বা দু'জনেই তাকে দেখেছি।'

'কে সে?'

'জানি না। আমাদের পক্ষে জানাও সম্ভব নয়। একমাত্র আপনি আর গণেশ দাদু ছাড়া এ বাড়ির আর কাউকে চিনি না। তাছাড়া বারান্দায় তখন আলো নেভানো ছিল। তাই বলতে পারব না কে সে। তবে কেউ একজন তো বটেই।'

ইতিমধ্যে পুলিস এসে গেল। স্থানীয় দারোগা। সঙ্গে একজন কনস্টেবল্। তাতনরা আর দাঁড়ালো না। ফিরে এলো নিজেদের ঘরে।

ঘরে ঢুকেই বুম্বা বলল, 'চারদিকেই যে ভেল্কির খেলা। মন্দিরে ভেল্কি, ঘরে ভেল্কি। তবে কেসটা এইবার জমেছে মনে হচ্ছে। একটা গুপ্ত সুড়ঙ্গ, সেখানে মানুষের রহস্যময় চাপা গলার আওয়াজ, বাড়ির পুরনো মালী অজ্ঞাত আততায়ীর হস্তে নিহত এবং তার কিছুক্ষণ পরেই জানা গেল চৌধুরীবংশের একটি দুষ্প্রাপ্য

সম্পত্তি নিখোঁজ। এর পরেও আবার রহস্য চাই তাতনবাবু? সরি, বাপ্পাদিত্য সেনগুপ্ত, দ্য গ্রেট ইয়াং ইনভেস্টিগেটর?'

তাতন ওর দিকে চেয়ে ছিল বটে, কিন্তু ও কোনো কথাই শোনেনি তা ওর মুখ দেখলেই বোঝা যায়। ওর মুখে এখন অনেক চিন্তার ছাপ। আর শুভ্র বেশ নিষ্প্রভ হয়ে খাটের ওপর বসে ছিল। বেশ বোঝা যায় চৌধুরীবংশের একটা মূল্যবান সম্পত্তি খোয়া যাওয়ায় ওর মন খারাপ। মাঝে একবার একে একে ওদের তিনজনের ডাক পড়ল দারোগাবাবুর কাছে, জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে। মামুলি সব প্রশ্ন। যা তাতন আগেই করেছিল। খাওয়া-দাওয়া সেরে বুম্বা টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল। শুভ্র বসল একটা গল্পের বই নিয়ে। আর তাতন বসল মিস্টার র-এর কাছ থেকে পাওয়া চিঠিটা নিয়ে—যার মধ্যে ধাঁধাটা লেখা ছিল।

ঘন্টা খানেক পরে শুভ্র জিজ্ঞাসা করল, 'কী রে, পেলি? ধাঁধার উত্তর?'

'নাহ্।' বলে তাতন আবার ডুবে গেল কাগজের মধ্যে। বিকেল চারটে নাগাদ হঠাৎ তাতন বলে উঠল, 'এখন একবার গণেশ দাদুকে দরকার ছিল রে।'

বই থেকে মুখ না তুলেই শুভ্র বলল, 'হঠাৎ, গণেশ দাদুকে কী দরকার?'

'দুটো প্রশ্নের উত্তর পাওয়া খুবই দরকার। চ তো দেখি ওঁকে পাওয়া যায় কিনা।'

গণেশ হালদারকে ওর ঘরেই পাওয়া গেল। দরজা ভেজানোই ছিল। টোকা দিতেই সে বেরিয়ে ওদের দেখে বলল, 'বেড়াতে বেরুচ্ছ নাকি? চা খেয়েছ?' শুভ্র কী বলতে যাচ্ছিল। তাতন ওকে থামিয়ে দুম করে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা গণেশ দাদু, আপনি তো এ বাড়ির পুরনো লোক। বলতে পারেন, এ বাড়িতে কে গান করেন?'

'গান? এ বাড়িতে? কই, কেউ না তো! ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, গিন্নী মা বেঁচে থাকতে গান গাইতেন।'

'নিশ্চয় তানপুরায়?'

'হ্যাঁ, তানপুরায়। বড় কর্তার ঘরে এখনো আছে সেটা। তবে কেউ আর এখন ওটা ব্যবহার করে না। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ওটা এখনো বড় কর্তা নিজের ঘরে রেখে দিয়েছেন। নইলে—'

'আর একটা প্রশ্ন, এ বাড়িতে কার মাথায় কোঁকড়ানো চুল আছে?'

'কোঁকড়ানো চুল? কই, তেমন লোক তো কেউ নেই। তবে সরলার ছেলের মাথায় কিছুটা কোঁকড়ানো চুল আছে।'

'নিশ্চয় কালো?'

'হ্যাঁ। ঐটুকু ছেলে, কালো চুল তো হবেই।'

'ওকে একবার ডাকা যাবে?'

প্রৌঢ় গণেশ হালদার একটু বিস্মিত হয়ে তাতনকে দেখল। ভাবখানা, ঐটুকু ছেলে বুড়ো ইনসপেক্টরের মতো প্রশ্ন করে কেন? তবে কর্তার নাতির বন্ধু, তাকে কিছু বলাও যায় না, তাই সে সাধারণভাবেই বলল, 'ডাকা যাবে নিশ্চয়। তবে এসব প্রশ্ন কেন করছ ভাই?'

'এমনি। আপনি কী দয়া করে তাকে একটু ডেকে দেবেন?'

'নিশ্চয়।' বলে গণেশ হালদার চলে গেল।

একটু পরেই এল সরলার ছেলে। বছর সাতাশ-আটাশ মতো বয়েস। দোহারা কালো চেহারা। মাথার চুল ঘন এবং কোঁকড়ানো। তবে নিগ্রোদের মতো নয়।'

'তোমার নাম কী?'

লোকটা ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'বলাই।'

'রাত্রে বড় কর্তার ঘরে তুমিই শোও?'

'হ্যাঁ।'

'পরশু রাত্রে বারান্দায় তুমি পায়চারি করছিলে? এই ধর, রাত তিনটে নাগাদ?'

'না।'

'আজ ভোর রাতে বাগানে গিয়েছিলে?'

'না।'

'ভেবে বল।'

একটু বিরক্ত হয়ে বলাই বলল, 'শুধু শুধু কেন বাগানে যাব? বাগানে আমার কোনো কাজই নেই।'

'উমাকে চিনতে?'

'কে না চেনে?'

'তার সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়েছিল?'

'আমি কী পাগল যে তার সঙ্গে ঝগড়া হবে?'

'এ বাড়িতে কতদিন আছ?'

'জন্ম থেকেই।'

'রাত্রে কোনোদিন কর্তাবাবুকে ঘুম থেকে উঠতে দেখেছ?'

'কী করে দেখব, সারাদিন গাধার খাটুনি, শুলে আমার কোনো জ্ঞান থাকে না।'

'অর্থাৎ কর্তাবাবুর রাত্রে দরকার পড়লেও তোমার ঘুম ভাঙবে না! ভালো লোককেই বেছে নেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, তুমি এখন যাও।'

ও চলে যেতে শুভ্র জিগ্যেস করল, 'এ বাড়িতে কে গান করত তা দিয়ে তোর কী দরকার?'

'তানপুরাটায় বোধহয় রিসেন্টলি কেউ হাত দিয়েছিল।'

'তার মানে?'

'গণেশ হালদার বললেন গিন্নিমা বেঁচে থাকতে তানপুরা ব্যবহার হতো। এখন হয়না। তারমানে দীর্ঘদিন ঐভাবে পড়ে আছে। এতদিন পড়ে থাকার পরেও তানপুরাটায় যতখানি ধুলো থাকার কথা ততটা নেই।'

'হয়ত বলাই ঝাড়পোছ করে।'

'তাহলেও অঙ্ক মিলছে না। যে ঝাড়পোছ করবে সে সব কিছু ঝাড়পোছ করবে। কিন্তু তানপুরার গায়ে কিছু না হলেও দিন পনেরর মতো ধুলো জমে আছে। অর্থাৎ কিছু দিন আগে কেউ তানপুরাটাই পরিষ্কার করেছে। অথচ অন্য আসবাবপত্র তেমন পরিষ্কৃত নয়। কেন?'

'আর কোঁকড়ানো চুল?'

'তুই ভালো করে লক্ষ্য করিসনি, উমা পাগ্‌লার হাতে বেশ কয়েকগাছা কোঁকড়ানো কালো চুল আটকানো ছিল।'

'তার মানে, তুই সরলার ছেলেকেই উমা পাগ্‌লার হত্যাকারী হিসেবে ভাবছিস?'

'ভাবনার কী আর শেষ আছে রে? তাছাড়া সরলার ছেলে যে সরল হবেই এ গ্যারান্টি দিতে পারবি? চ আজ একবার মন্দিরটা ঘুরে আসব।'

'এখন গিয়ে কিন্তু কোনো লাভ হবে না। কারণ, একটু পরেই তো পুরোহিত আসবেন।'

'তবু চ।'

সন্ধ্যে হবার আগেই ওরা মন্দিরে পৌঁছল বটে কিন্তু কোনো লাভ হ'ল না, কারণ পুরোহিত এসে গিয়েছিলেন। উনি পুজোর যোগাড়ে ব্যস্ত। এদিক-সেদিক খানিকটা ঘোরাঘুরি করে ওরা ফিরে এসে দেখল, তাতনের প্রত্যাশিত চিঠি এসে গেছে। এবার চিঠিটা দিল গণেশ হালদার। চিঠিটা নাকি দিয়ে গেছে স্থানীয় পিওন। যদিও খামের গায়ে কোনো পোস্টাফিসের স্ট্যাম্প নেই।

চিঠিটার জন্যে তাতন নিশ্চয় উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল। পেয়েই সোজা নিজের ঘরে এসে পড়তে শুরু করল।

'তাতনবাবু, উমা পাগ্‌লার খুনের ব্যাপারে তোমাদের কিছু করার নেই তা জানি, তবু প্রথমেই ওকে নিয়ে পড়লে কিন্তু অনেক খবর পেতে। যাই হোক, ওর কাছে যা জানার সে সব আমি জেনে নিয়েছি। আমি জানতাম, রত্নহার চুরি যাবে। যেতেই হবে। কারণ উমা পাগ্‌লা যখনি মরেছে তখনি জানি আর রত্নহার খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে এটাও জেনে রাখ, রত্নহার এখনও বেশিদূর যেতে পারেনি। কাছাকাছিই আছে। আমার ধাঁধার উত্তর পেলে? ওটার উত্তর পেলে রহস্যের অনেকখানি দেখতে পেতে। একটা সূত্র দিচ্ছি। ঐ লাইনে চিন্তা করলে

তোমার পক্ষে ধাঁধাটা সমাধান করা সহজ হবে। ছেলেবেলায় এক দুই শিখেছিলে কী ভাবে? তা যদি মনে করতে পার তাহলে অনেকটা এগুতে পারবে। তোমার বন্ধু বুম্বাকে বোলো, ওর সাহস আমার ভালো লেগেছে। তবে খালি হাতে ওভাবে ওর যাওয়া উচিত হয়নি। যে-কোনো মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারত। ও হঠাৎ যে আবিষ্কার করেছে, তার জন্যে ওকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। ওর জন্যেই চৌধুরীবাড়ির সব রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার আয়নার মতো। ইচ্ছে করলে আমি এখনি সব রহস্যের সমাধান করে দিতে পারি। কিন্তু রানা চৌধুরী তোমাকে নেগলেক্ট করেছেন, তার যোগ্য উত্তর যে তোমাকেই দিতে হবে। আমি তোমাদের সঙ্গে ই আছি। খুব শীঘ্রই দেখা হবে। ইতি—র।'

চিঠিটা পড়ে বুম্বা বলল, 'আমি হলফ করে বলতে পারি লোকটা বাঙালি।'

তাতন মৃদু হেসে বলল, 'এতোদিনে বুঝলি?'

'কিন্তু লোকটা কে?'

'চিনেও চিনতে পারছি না। আর সব থেকে গন্ডগোল ঐ 'র' অক্ষরটা। কে হতে পারে রবীন্দ্র, রমেন্দ্র, রথীন্দ্র, রজতেন্দ্র না রণেন্দ্র?'

এতক্ষণে শুভ্র বলল, 'কিন্তু লোকটা যে আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।'

'এত সহজে যদি মানুষ চেনা যেত—! কে বলতে পারে লোকটা আমাদের ল্যাজে খেলাচ্ছেনা?'

'তাতে তার লাভ?'

'লাভ একটাই। মতলববাজ হ'লে আমরা মিসগাইডেড হব। তাতে তার কাজের অনেক সুবিধা। দেখা যাক।' বলেই তাতন আবার ধাঁধাটা নিয়ে পড়ল।

॥ এগারো ॥

রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত শুভ্র আর বুম্বা আগাগোড়া উমা পাগ্‌লার খুন আর রত্নহার নিখোঁজ নিয়ে গভীর আলোচনা করল। কিন্তু দু'জনের কেউই কোনো সমাধানে আসতে পারল না। একটা জায়গায় এসে ওরা দু'জনেই থেমে যাচ্ছিল। উমা পাগ্‌লার হত্যা এবং রত্নহার চুরির মধ্যে কোনো অদৃশ্য যোগাযোগ আছে কিনা, সেটা বার করা ওদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হ'ল না! শুভ্র একবার বলল, 'নিশ্চয় উমা পাগ্‌লা চোরকে দেখতে পেয়েছিল। তাই নিজেকে বাঁচাবার জন্যে চোর উমা পাগ্‌লাকে খুন করেছে।' কিন্তু বুম্বা ওর যুক্তি খণ্ডন করে বলেছিল, 'রত্নহার চুরি করতে গেলে চোরকে আসতে হবে দাদুর ঘরে। আর উমা পাগ্‌লাকে যদি সেই চোরকে দেখতে হয় তাহলে তাকেও আসতে হবে দাদুর ঘরে। সেটা কোনোভাবেই উমা পাগ্‌লার পক্ষে সম্ভব নয়।'

শুভ্রর যুক্তি জোরালো ছিল না। শেষ পর্যন্ত দু'জনেই চুপ করে গিয়েছিল। তাতনকে ওরা এ ব্যাপারে ডিসটার্ব করেনি। কারণ, ও জানলার ধারে চেয়ার টেনে গভীরভাবে ডুবে গিয়েছিল ধাঁধার মধ্যে। দু-একবার ওরা ডেকেও কোনো সাড়া পায়নি। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ওদের খাবার এল। কারোর সঙ্গে কোনো কথা না বলে তাতন গোগ্রাসে নিজের খাবার খেয়ে আবার চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল। শুভ্র আর বুম্বা খাওয়া-দাওয়া সেরে খানিকক্ষণ বারান্দায় পায়চারি করে তারপর শুয়ে পড়ল।

পুরনো আমলের বড় দেয়ালঘড়িটা ঠিক যে মুহূর্তে ট্যাং শব্দ করে রাত একটা ঘোষণা করল, তাতনের মুখ থেকে ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা শব্দ বেরুল, 'আরে, তাইত!'

ওর কোঁচকানো ভ্রূ দুটো ক্রমশঃ সোজা হতে থাকল। মুখ ঘুরিয়ে দেখল, দুই বন্ধু তখন নাক ডাকাচ্ছে। ওদের বিরক্ত না করে নিজের মনেই বিড়বিড় করল, 'সাবাস মিস্টার র, তুমি ভালো না মন্দ লোক জানিনা, কিন্তু তুমি হিন্ট্স্ না দিলে এ ধাঁধা আমার পক্ষে সল্ভ্ করাই সম্ভব হ'ত না। এদিকটা তো আমি একদম চিন্তাই করিনি।' বলেই ও খাতা পেন্সিল নিয়ে কী সব হিজিবিজি কাটতে শুরু করে দিল।

ঘড়িতে আরো একবার ট্যাং শব্দ হ'ল। তাতনের মুখ থেকে বেরুলো, 'অ্যাঁ, তাই নাকি? আচ্ছা বেশ, তাই যদি হয়, তাহলে সেটা কী? নিশ্চয় কোনো মূল্যবান কিছু। নইলে এত কষ্ট করে ওভাবে...মিস্টার 'র' আরো বলেছেন, দাদুকে জিগ্যেস করতে রত্নহারটা ঠিক জায়গায় আছে কিনা। তা সেটার তো আর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। রত্নহার হাওয়া। তাহলে আর কী থাকতে পারে? এদিকে উমা পাগ্লাই বা খুন হবে কেন? সে কী করেছিল? চৌধুরীবাড়ির কোনো গোপন সংবাদ জেনে ফেলেছিল? যদি সেই কারণে খুন হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয় সংবাদটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গুপ্ত সিন্দুকের খবর জানতেন মাত্র দু'জন, রানা চৌধুরী আর গণেশ হালদার। কিন্তু গণেশ হালদার যতই বিশ্বস্ত হোক, যতই পুরনো হোক, সে এ বাড়ির একজন কর্মচারী মাত্র। একজন কর্মচারীর পক্ষে অমন দুষ্প্রাপ্য জিনিসের সংবাদ জানা কী লজিক্যাল? বিশেষ করে রানা চৌধুরী নিজেই বলেছেন অমন রত্নহার সারা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। তিনি কোন্ যুক্তিতে গণেশ হালদারের মতো কর্মচারীকে সেই গোপন সংবাদ দিয়ে রাখবেন? নাহ্, সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ওদিকে মন্দিরের নিচে পাতালপুরী। গুপ্ত সুড়ঙ্গ। সেখানে মানুষের গলার চাপা চিৎকার। নিশ্চয় ভূত প্রেত নয়। সে অবশ্য নিজের কানে শোনেনি। কিন্তু ঘটনা যদি সত্যি হয় তাহলে নিশ্চয় ওখানে কেউ আছে। কিন্তু কে সে? চৌধুরীবাড়ির কেউ? কিন্তু চৌধুরীবাড়িতে তো গোনাগুণতি লোক। তাহলে?

কোথায় যে কী জট পাকিয়ে আছে কিছুতেই তাতন বুঝে উঠতে পারল না। তার এখানে আসা থেকে এ পর্যন্ত পর পর যে-সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, কোনোটার সঙ্গে কোনোটার লিংক নেই। অথচ প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে একটা অদৃশ্য যোগাযোগ নিশ্চয় আছে। নাহ্, মিস্টার 'র' ঠিকই বলেছিল, সামনে গভীর রহস্য। কিন্তু মিস্টার 'র'-এর ইনটারেস্ট কী? আমাকেই বা কেন এত তথ্য সাপ্লাই করে যাচ্ছেন? পাঁচ 'র'-য়ের কী তিনি একজন? তাই যদি হয়, তাহলে কী বন্দুকটা আমার কাঁধে রাখতে চাইছেন? ওঁরও কী উদ্দেশ্য রত্নহার?

ভাবতে-ভাবতে আবার একটা ট্যাং শব্দ। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ও চম্‌কে উঠল, রাত কখন দুটোর ঘরে চলে এসেছে তা ওর খেয়ালই ছিল না। আলো নিভিয়ে তাতন শুয়ে পড়ল। কিন্তু তখন যদি ও না শুতো তাহলে একটা দারুণ বিস্ময়কর ঘটনা ওর চোখে পড়ত।

সে বিস্ময়কর ঘটনাটা টের পাওয়া গেল পরদিন সকালে।

সাতটা নাগাদ ঘুম ভাঙল বুম্বার। শুভ্র তখনও ঘুমচ্ছে। কিন্তু তাতনকে দেখতে পেল না। ভাবল, হয়ত বাথরুমে গেছে। গায়ে চাদরটা জড়িয়ে নিয়ে ও জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আবছা অন্ধকার ঘেরা বাগানটা দেখছিল। সকালের রোদ আস্তে আস্তে অন্ধকারটা সরিয়ে দিচ্ছে। দেখতে-দেখতে আধ ঘণ্টা কেটে গেল। শুভ্র তখনও ঘুমচ্ছে। কিন্তু তাতনের কোনো দেখাই নেই। শুভ্রকে গিয়ে ও ডেকে তুলল। জিগ্যেস করল তাতনের কথা। প্রথমটা শুভ্র তাতনের ব্যাপারে তেমন কোনো উদ্বিগ্ন হয়নি। কিন্তু আটটা বেজে যাবার পরও যখন তার কোনো সংবাদ পাওয়া গেল না তখন দুজনেই খানিকটা চিন্তায় পড়ে গেল। তবে কী ও কোথাও বেরুল? বাইরে এসে ওরা প্রথমেই গণেশ হালদারের খোঁজ করল। কিন্তু তাকেও পাওয়া গেল না। বাড়ির কোনো ঝি-চাকর তাতন বা গণেশ হালদার, কাউকেই সকাল থেকে দেখতে পায়নি। বুম্বাকে উদ্দেশ্য করে শুভ্র বলল, 'চল্ তো দেখি, দাদুর ঘরে রয়েছে কী না?'

কিন্তু দাদুর ঘরের সামনে এসে দেখল, দাদুর ঘর তখনও ভেজানো। টুক টুক করে দরজায় বার-দুয়েক টোকা দিতেই ভেতর থেকে শব্দ এল, 'কে? গণেশ?'

দরজা সামান্য ঠেলে শুভ্র বলল, 'না দাদু আমি শুভ্র।'

'ও; ভেতরে এসো। এতো সকালে, বেড়িয়ে ফিরলে নাকি?'

'না। ঘুম থেকে উঠে তাতনকে দেখতে পাচ্ছি না। তাই ভাবলাম, আপনার ঘরে যদি এসে থাকে—'

'না, ও তো আসেনি। গণেশকে জিগ্যেস করেছিলে?'

'তাঁকেও তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'সেকি! গণেশ আবার গেল কোথায়?'
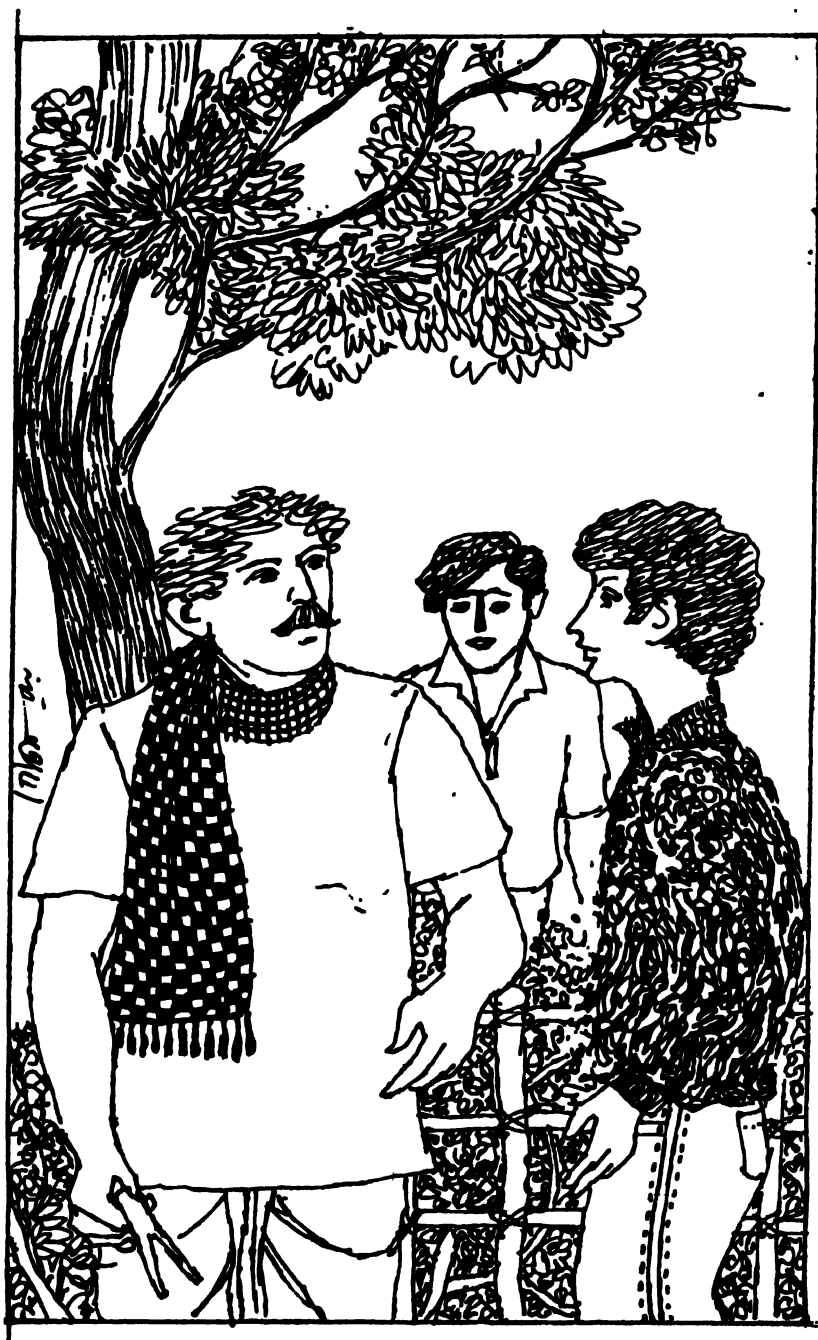
'হয়ত পুজোর যোগাড়যন্ত্রে ব্যস্ত আছে।'

'পুজোর যোগাড়ের আর কী আছে? আর কোনো ধুমধাম হবে না। ওই নমো-নমো করে যা হয় হবে।'

'একথা কেন বলছেন?'

'উমা পাগ্‌লা পাগ্‌লামির ঝোঁকে ঠিক কথাই বলত। চৌধুরীবাড়িতে পাপ ঢুকেছে। সত্যিই বোধ হয় পাপ ঢুকেছে। নইলে সৌভাগ্য-লক্ষ্মী পালিয়ে যায়? আত্মীয়-স্বজনের কাছে মুখ দেখাবো কী করে? বিশেষ করে আমার জাত শত্তুর, ঐ যে বাড়ি ভাগ করে নিল, আমার ছোট ভাই রমেন্দ্রনারায়ণ, ও যদি জানতে পারে রত্নহার আর চৌধুরীবাড়িতে নেই, ভেবেছ আমাকে ছেড়ে দেবে?'

'কিন্তু—' বুম্বা অনেকক্ষণ পরে বলল, 'জিনিসটা তো আপনার। তাতে অন্য কারো বলার কিছু থাকতে পারে না—'

রানা চৌধুরী ক্ষীণ হেসে বললেন, 'আসল গণ্ডগোল বাধবে সেখানেই। এ বংশের নিয়ম অনুসারে, আমার মৃত্যুর পর রত্নহার বা অন্য যা কিছু সব ওদেরই সম্পত্তি।'

'তার মানে?' শুভ্র ও বুম্বা দু'জনেই আশ্চর্য হয়ে একসঙ্গে প্রশ্নটা করল।

'চৌধুরীবংশের নিয়ম, যে কোনো তরফেরই হোক না কেন, বংশের জীবিত জ্যেষ্ঠ পুরুষ-সন্তানের কাছেই রত্নহার হস্তান্তরিত হবে। রমেনের ছেলে রমেন্দ্রই এখন এ বংশের জীবিত জ্যেষ্ঠ সন্তান। রথীন্দ্রর থেকেও ছমাসের বড়। তাই আমার মৃত্যুর পর আমার বড় ছেলে রথীন্দ্র তা পাবে না। রমেন্দ্র যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে রত্নহার পাওয়া যাচ্ছে না, ও তা বিশ্বাস করবে না। ভাববে, আমি প্ল্যান করে ওটা সরিয়ে রেখেছি। ওদের ফাঁকি দিতে চাচ্ছি। তাই ঠিক করেছি পুজোর আগে যদি রত্নহার না পাই ধুমধাম আর করব না।'

'কিন্তু—' বুম্বা বলল, 'তাতেও তো ও পক্ষের সন্দেহ হতে পারে?'

'ধুমধাম করা না-করা সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তা নিয়ে একমাত্র ব্যঙ্গ করা ছাড়া আর ওদের কিছু করার থাকবে না। এইভাবে চলবে, যতদিন বেঁচে থাকব। তারপর, মরে গেলে, বয়ে গেল, দেখতেও আসব না কী হচ্ছে না-হচ্ছে।'

স্পষ্টই বোঝা গেল রানা চৌধুরী আফসোসে আর অনেক দুঃখে কথাগুলো বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

এদিকে বুম্বা আর শুভ্র উসখুস করা শুরু করল। এসব শুনে ওদের যেমন কোনো লাভ ছিল না, ওদের মন তখন পড়ে ছিল তাতনের সংবাদের জন্যে। রানা চৌধুরীর তা চোখ এড়ালো না। তিনি শুয়ে-শুয়েই হাঁক দিলেন, বলাই, বলাই—'

বলাই আশেপাশেই কোথাও ছিল! কর্তার ডাকে ছুটে এসে মাথা হেঁট করে

দাঁড়াল।

রানা চৌধুরী বললেন, 'এই বাবুদের আর এক বন্ধুকে তুমি দেখেছ?'

'আজ্ঞে না বাবু।'

'ভালো করে খুঁজে দেখো কোথায় গেল ছেলেটা।'

'আচ্ছা বাবু।' বলেই বলাই চলে গেল।

একটু পরে রানা চৌধুরী বললেন, 'কোথায় আর যাবে? গোয়েন্দাগিরি করছে হয়ত। পাবে না, পাবে না। এ বংশ থেকে যা একবার চলে যায় তা আর ফিরে আসে না। তোমাদের খাওয়া হয়েছে, না বন্ধুর জন্যে—'

'আজ্ঞে—' মাথা চুলকালো শুভ্র, 'তাতন আসুক, তারপর খাব।'

বৃদ্ধ আর কিছু বললেন না। একটু পরে ওরা দু'জনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। বাগানটা ভালো করে খুঁজে দেখল। মন্দিরেও গেল। কোথাও নেই। এমন কী, রমেন্দ্রনারায়ণের বাড়ির দিকেও একবার ঢুঁ মারল। রমেন্দ্রনারায়ণ রানা চৌধুরীর থেকে কিছু ছোট। কিন্তু বেশ শক্ত-সমর্থ। উনি বাগান পরিচর্যা করছিলেন। গেটের মুখে শুভ্র আর বুম্বাকে দেখে কাছে ডাকলেন, 'কই, তোমরা তো এলে না? বড় কর্তার বারণ বুঝি?'

মাথা হেঁট করে শুভ্র বলল, 'না, উনি তো অসুস্থ। জানেনই না আপনার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে।'

কাঁচি দিয়ে একটা চন্দ্রমল্লিকার বিবর্ণ পাতা ছাঁটতে ছাঁটতে রমেন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'অসুস্থ? বড় কর্তা? কী হয়েছে?'

'একটা মাইল্ড অ্যাটাক। দিনরাত শুয়েই আছেন। ডাক্তারের বারণ তো।'

'হুঁ।' বলে উনি চুপ করে গেলেন।

একটু পরে শুভ্র জিজ্ঞাসা করল, 'তাতনকে দেখেছেন?'

'কে তাতন?'

'আজ্ঞে আমার আর এক বন্ধু। সকাল থেকে ওকে দেখতে পাচ্ছি না, তাই একবার খোঁজ নিতে এসেছিলাম।'

'না, তোমার কোনো বন্ধু তো এদিকে আসেনি। তা, প্রথম আমার বাড়িতে এলে, একটু চা-টা খাবে তো?'

'আজ্ঞে, তাতনকে না পেলে—'

'বটেই তো। কিন্তু যাবে কোথায়? নিশ্চয় এসে যাবে। তা ওকে নিয়ে কালীপুজোর মধ্যেই একদিন এসো। আমার এই দাদাটি আমার সঙ্গে শত্রুতা করলেও, প্রতিমা, মানে—তোমার মা আমার খুব ন্যাওটা ছিল।'

ফস্ করে বুম্বা একটা প্রশ্ন করে ফেলল, 'কিন্তু আপনার সঙ্গে ওনার এত ঝগড়া কেন?'

প্রশ্নটা শুনেই বৃদ্ধ রমেন্দ্র চৌধুরী কঠোর দৃষ্টিতে ফিরে তাকালেন। বুম্বাও বুঝতে পেরেছিল, একান্ত ব্যক্তিগত এ প্রশ্ন করা তার উচিত হয়নি। ও 'স্যরি' বলে চুপ করে গেল।

একটু পরে শুভ্র বলল, 'তাহলে আজ আমরা আসি।'

'অ্যাঁ, ও—হ্যাঁ, এসো।'

ওরা চলে আসছিল। হঠাৎ রমেন্দ্র চৌধুরী ওদের ডাকলেন। তারপর বুম্বার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'এটা আমাদের পারিবারিক ব্যাপার। নাই বা শুনলে। একদিন এসো। তোমাদের মতো ইয়াং ছেলেদের দেখলেও ভালো লাগে। যাও— দেখ বন্ধু ফিরল কিনা।'

কিন্তু বাড়ি ফিরেও ওরা দুজনের কারোরই ফিরে আসার সংবাদ পেল না। দেখতে-দেখতে দুটো বেজে গেল। খিদেয় ওদের পেট চুঁই-চুঁই করছিল। দশটা নাগাদ সামান্য কিছু জলখাবার খেয়েছিল। তিনটে নাগাদ বুম্বা বলল, 'আচ্ছা, আমার কথা শুনে তাতন মন্দিরের সুড়ঙ্গ পথ দেখতে যায়নি তো?'

শুভ্র বলল, 'একা একা?'

'ও যা ছেলে, ওর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।'

'তাহলে চল্, আমরাও যাই।'

'কিন্তু তোর দাদু! দাদুকে কিছু বলবি না?'

কী যেন একটু চিন্তা করে শুভ্র বলল, 'একে উনি অসুস্থ, তার ওপর কয়েকটা শকিং ঘটনা, এর মধ্যে আবার আমরা সুড়ঙ্গে নামছি শুনলে কিছুতেই পারমিশন দেবেন না। চল্ তো আগে ঘুরে আসি, তারপর দেখা যাবে।'

ওরা তখনও বাগানে পৌঁছয়নি, পেছন থেকে বলাই 'দাদাবাবু' 'দাদাবাবু' বলে ছুটে এসে ওদের ধরল, 'কোথায় যাচ্ছেন? কর্তাবাবু তোমাদের ডাকছেন।'

শুভ্র আর বুম্বা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল, তারপর বলল, 'এখুনি?'

'হ্যাঁ, বললেন, খুব জরুরী।'

'চল।'

ঘরে ঢুকতেই দাদু জিজ্ঞাসা করলেন, 'ফিরল তোমাদের বন্ধু?'

'না, এখনো ফেরেনি।'

'এদিকে গণেশও নিপাত্তা। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'গণেশ দাদুকে কী আপনি কোথাও পাঠিয়েছেন?'

'না। কোত্থাও না।'

'ওঁর ঘরে নেই তো উনি?' শুভ্র একটু থেমে থেমে বলল 'মানে, যদি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন—'

'এই নিয়ে আমি চারবার বলাইকে পাঠিয়েছিলাম গণেশ আর তোমার বন্ধুর

খোঁজ নিতে। দু'জনের কেউই তাদের ঘরে বা আশপাশে কোথাও নেই।'

'তাহলে তো বড় চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। আচ্ছা ওরা কী—'

পাশ থেকে শুভ্রর চিম্‌টি খেয়ে বুম্বা থেমে গেল।

'ওরা কী মানে?' থামলে কেন? কিছু বলবে?'

'না—মানে,' বুম্বা কথা ঘোরাবার চেষ্টা করল, 'গণেশ দাদু যদি তাতনকে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যান—'

'বোকার মতো কথা বোলো না। আমার হুকুম ছাড়া গণেশ—,' হঠাৎ কথা থেমে গেল রানা চৌধুরীর, তারপর প্রায় আপনমনেই বিড়বিড় করলেন—'গণেশ পালাল না তো?'

শুভ্র আর বুম্বা দু'জনেই একসঙ্গে বলে উঠল, 'কী বলছেন আপনি?'

'একমাত্র আমি আর গণেশ ছাড়া রত্নহারের সন্ধান কেউ জানত না। আমার ঘুম আর অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে যদি—'

শুভ্র আমতা-আমতা করে বলল, 'কিন্তু গণেশ দাদু, সংসারে যার তিনকুলে কেউ নেই, এই বয়েসে—'

'কতটুকু দেখেছ?' ধমকে উঠলেন রানা চৌধুরী, 'ষোল সতেরো বছর বয়েসে মানুষের কতটুকু দেখেছ? লোভ। লোভের কাছে মানুষ পশু। সেখানে বয়েস, রক্তের সম্পর্ক এসব কিস্‌সু না। হ্যাঁ, পারে, এখন আমার কেমন যেন বিশ্বাস হচ্ছে, একমাত্র গণেশই একাজ করতে পারে—'

'তাহলে তো এখুনি পুলিসে খবর দেওয়া দরকার।'

'দাও তো প্যাড্ আর কলমটা। ওই যে ছোট বুক-কেসটার ওপরেই আছে।'

শুভ্র গিয়ে প্যাড্ আর কলমটা এনে দিল। বৃদ্ধ খসখস করে কী যেন লিখলেন। তারপর লেখাটা ভাঁজ করে শুভ্রর হাতে দিয়ে বললেন, 'বলাইকে নিয়ে এক্ষুণি থানায় চলে যাও। বড় দারোগা, মানে, শিবু ঘোষালের হাতে দেবে। চেনো তো? পারলে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। শেষকালে গণেশ—ধরা পড়লে শয়তানটার গর্দান আমিই নোব। বেইমান কোথাকার!'

চিঠিটা পকেটে পুরতে-পুরতে শুভ্র বলল, 'দাদু, আপনার শরীর খারাপ, এত উত্তেজিত হবেন না। হয়ত গণেশ দাদু কোথাও আটকে গেছেন।'

চাপা হুংকারে রানা চৌধুরী বললেন, 'তোমরা কিস্‌সু জানো না। বোঝ না। যাও, এক্ষুণি থানায় চলে যাও। কে জানে, ব্যাটাচ্ছেলে এখন এ গ্রাম ছেড়ে কত দূরে ভেগেছে।'

বৃদ্ধ হাত ভাঁজ করে চোখের ওপর চাপা দিলেন। শুভ্র আর বুম্বা দরজা ভেজিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

বুম্বা বলল, 'থানাটা কোন্ দিকে রে?'

'কে এখন থানায় যাচ্ছে? আগে তাতন, তারপর থানা।'

'তবে থানায় একটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখলে ভালোই হ'ত।'

'ঘোষাল দারোগা ছাড়ত কিনা। সঙ্গে করে নিয়ে আসত।'

'দেরি হলে তোর দাদু আরও রেগে যাবেন না তো?'

'দেখ্ বুম্বা, আমার কাছে রত্নহার আর গণেশ হালদারের থেকে অনেক বেশি আপনজন হচ্ছে তাতন। দেরি করিস না, চল্। আবার বলাই দেখতে পেলে ফ্যাচাং বাড়বে।'

বলেই ওরা দু'জনে দ্রুত পা চালাল মন্দিরের উদ্দেশ্যে। কিন্তু খুব বেশিদূর যেতে হ'ল না। ডীপ নেভি ব্লু রঙের জীন্‌স্ শার্ট দেখেই ওরা চিনতে পেরেছিল। মাথা নিচু করে হন্‌হন্ করে তাতন এদিকেই আসছে। ধড়ে যেন প্রাণ এল দু'বন্ধুর। সামনে আসতেই শুভ্র খেঁকিয়ে উঠল, 'কোথায় গিয়েছিলি রে হতচ্ছাড়া! একদিন তো বুম্বা ভোগালো। আজ আবার তুই—'

তাতন সে-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, 'তোরা আমার খোঁজে বেরিয়েছিস?'

'তবে এখানে আর কে আছে যে তার জন্যে এত বেলা অবধি না খেয়ে চারদিকে চক্কর মারব? অবশ্য এবার থানায় যেতে হবে।'

'থানা? কেন, ফিরছি না দেখে ডাইরি-টাইরি করিয়ে এসেছিস নাকি?'

'না, যেতে হবে আরো একজনের জন্যে।'

গভীর দৃষ্টিতে শুভ্রর দিকে তাকিয়ে তাতন বলল, 'আরো একজন মানে?' 'গণেশ হালদার?'

'হ্যাঁ, গণেশ হালদার নিখোঁজ। সকাল থেকেই। তুই জানলি কী করে? গণেশ দাদু কী তোর সঙ্গে ছিল?'

'না। জানিও না সে কোথায়। তবে আমার মন বলছিল গণেশ হালদার আর এখানে থাকতে পারে না।'

'এসব কী বলছিস্ তুই!'

'সে সব পরে হবে, চল চল, ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে। সকাল থেকে এক দানাও পেটে পড়েনি।'

'কিন্তু থানা? দাদু যে চিঠি লিখে দিয়েছেন। দেখ্‌না পড়ে।'

শুভ্র চিঠিটা তাতনের হাতে দিল।

'ও খেয়েদেয়ে গেলেই হবে।' বলতে-বলতে তাতন চিঠিটা খুলেই যেন চম্‌কে উঠল। তারপর চিঠিটা পড়ল। বেশ মন দিয়ে। পড়া শেষ করে বোকার মতো শুভ্রর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'কী দেখছিস হাঁদার মতো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে?'

'চিঠিটা পড়েছিস?'

'না, সময় পেলাম কখন?'

চিঠিটা এগিয়ে দিয়ে ও বলল, 'নে—পড়।'

চিঠিটা পড়ে শুভ্র বলল, 'তা এ তো খুব সিম্প্‌ল চিঠি। এতে এত বোকা হবার কী আছে?'

'নেই? তোর কাছে এটা আশা করিনি। আবার দেখ্ চিঠিটা। গোড়া থেকে।' তাতনের চোখ তখন চৌধুরীবাড়ির দিকে। শুভ্র আর বুম্বা চিঠির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তারপর হঠাৎই, ঠিক তাতনের মতোই, শুভ্র ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

'কী বুঝলি?'

'আমার সব কী রকম যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।'

'তাহলে বুঝতে পেরেছিস?'

'হ্যাঁ, কিন্তু—'

'নো কিন্তু, এতক্ষণে আমার কাছে প্রায় সব কিছু জলের মতো পরিষ্কার। সকাল থেকে আমার মাথায় একটা কথা ঘুরছিল। গণেশ হালদার এবার এখান থেকে সরে যাবে। নইলে অঙ্কটাই মিলবে না।'

বুম্বা এতক্ষণে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোরা কী সব হেঁয়ালি আরম্ভ করলি বলতো?'

'হেঁয়ালি কী রে? বল, সব হেঁয়ালি ক্লীয়ার হয়ে গেল। মাত্র একটা চিঠিতে সব জট ভ্যানিস।'

'দুর, চিঠিতে এমন কী রহস্য সমাধানের পথ লেখা আছে? এ তো দু'ছত্র কথা, দারোগা সাহেব, শীগ্‌গির আসুন। গণেশ পালিয়েছে। আমার বিশ্বাস ওই রত্নহার হাপিস করেছে। বেশি দেরি করলে ও আরো বেশিদূর পালাবার সুযোগ পাবে। ইতি— রানা চৌধুরী। তা এটা এমন একটা কী ইম্পর্ট্যান্ট চিঠি হ'ল?'

'হবে না, হবে না—এটা তোর লাইনই নয়! চোখ আর মন খোলা রাখলে অনেক কিছুই দেখতে পেতিস। আমি কিন্তু আর পারছি না। আমার প্রচন্ড খিদে পেয়ে গেছে।'

'কিন্তু থানা?'

'হবে—হবে, এবার তো আমাদেরই থানায় যেতে হবে। হার চোরকে ধরতে হবে না?'

ওরা দ্রুত এগিয়ে চলল চৌধুরীবাড়ির দিকে। বাড়ির কাছাকাছি এসে তাতন বলল, 'কালো কোঁকড়ানো চুলের লোকটাকে চিনতে পেরেছিস শুভ্র?'

মাতব্বরি ক'রে বুম্বা বলে উঠল, 'বলাই তো?'

'কিন্তু বলাই উমা পাগ্‌লাকে খুন করেনি।'

'তবে কে?'

'সে অনেক বড় ব্যাপার। শেষ দৃশ্যে সব দেখতে পাবি। অবশ্য সেই সময় তোর অনেক কাজ আছে। মানে যেটা তুই ভালো পারবি। আপাততঃ আমি আর শুভ্র ভালো করে জালটা গোটাতে শুরু করি। আঃ, এই সময় যদি রহস্যময় 'র'-কে পেতাম!'

'এই 'র' কোন্ 'র'?' শুভ্রর প্রশ্ন।

'সময়ে বৎস!'

'বেশ, কিন্তু তুই কোথায় ছিলি সারাদিন?' বুম্বা জিজ্ঞাসা করল।

'তোরই মতো, মন্দিরের নিচে চক্কর দিচ্ছিলাম।'

'মানুষের গলার চাপা শব্দটা শুনেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'তোর কী মনে হ'ল?'

'মনে হ'ল মানুষ এত বড় বিবেকহীন হয় কী করে?'

'আবার হেঁয়ালি শুরু করলি?'

'না। হেঁয়ালি প্রায় শেষ। ও—হ্যাঁ, শোন, তোদের ওপর একটা ভার রইল। রানা চৌধুরীকে কিন্তু চোখের আড়াল করিস না। এবার ওঁর নিখোঁজ হবার পালা। প্রথমে উমা পাগ্‌লা। তারপর গণেশ হালদার। এবার রানা চৌধুরী। সন্ধ্যেবেলা আমি একবার বেরুব। তোরা কেউ আমার খোঁজ করিস না। আমি ঠিক সময়ে ঘরে ফিরে আসব। তোর বড় মামা কবে আসছেন রে শুভ্র?'

'আমরা এখানে এসেছি পাঁচদিন। পুজোর হপ্তা-খানেক আগে ওঁর আসার কথা। মানে, এখনও দু-তিনদিন দেরি আছে।'

'দু-তিনদিন। অর্থাৎ এই দু-তিনদিন তাতন সেনগুপ্তকে চোখ আর কান খুলে রাখতেই হবে। নইলে পাখি ফুড়ুৎ।'

॥ বারো ॥

খেয়ে উঠেই তাতন রানা চৌধুরীর চিঠি নিয়ে বেরিয়ে গেল। খবরটা ও-ই দিয়ে দেবে। শুভ্র গম্ভীর আর থমথমে মুখে চুপচাপ বসে রইল। আর বুম্বার দৃষ্টি রানা চৌধুরীর দিকে। গণেশ হালদার আর ফেরেনি। ইতিমধ্যে থানার দারোগা মিস্টার ঘোষাল এসেছিলেন। এসেছিলেন ডাক্তার মুখার্জি। ওষুধ আর ইনজেকশান দিয়ে উনি বলে গেছেন—'রানা চৌধুরীর প্রচণ্ড টেনশন চলছে।' যাবার সময় ডাঃ মুখার্জি শুভ্রকে ডেকে বলে গেলেন, 'ওঁর হার্টের অবস্থা ভালো নয়। এরকম টেনশন গেলে সেকেন্ড অ্যাটাক হওয়া বিচিত্র নয়। ওষুধ খাইয়ে গেলুম। ওঁকে কেউ ডিসটার্ব কোরো না।'

দেখতে-দেখতে রাত ন'টা বাজল। ঘুমন্ত চৌধুরীবাড়ি আরো ঘুমিয়ে পড়ল। বলাইয়ের মা, মানে সরলা এসে ওদের খাবার দিয়ে নিচে নেমে গেল। সাড়ে ন'টায় তাতন ফিরল। আর, ও ফেরার পরই বলাই বারান্দার দরজা বন্ধ করে দিল। রাত সাড়ে দশটার মধ্যেই চৌধুরীবাড়ির বারান্দার আলো নিভে যেতেই বাড়িটা অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গেল।

বৈশাখের গভীর নিস্তব্ধ রাত। মনে হচ্ছে সারা ময়নাডাঙ্গার সব লোকই বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তা নয়। চৌধুরীবাড়িতেই তিনটি সতেরো বছরের ছেলে গভীর প্রতীক্ষা নিয়ে বসে আছে। কোথাও একটু খুট্ করে শব্দ হলেই ওরা উৎকর্ণ হয়ে দরজায় কান পাতে। তিন সেন্টিমিটার মতো দরজা ফাঁক রেখেছে। বারান্দায় যদি কারো ছায়া দেখতে পায়, এই প্রতীক্ষায়। দেখতে-দেখতে প্রথমে বুম্বা তারপর শুভ্র ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু তাতন রইল জেগে যতক্ষণ না ভোরের আলো দেখা যায়। এক সময় ভোর হ'ল। কেটে গেল একটা ঘটনাহীন রাত।

স্বাভাবিক কারণেই পরের দিন তাতনের উঠতে দেরি হ'ল। শুভ্র আর বুম্বা ওকে ডাকল না। নিজেরাই এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ালো। ওরা যখন বাগানে ঘুরছে হঠাৎ দেখল দারোগা মিস্টার ঘোষাল লোহার গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকছেন। ওদের দিকে ভদ্রলোক একবার তাকিয়ে বললেন, 'কী তোমরা সব ভালো তো?'

শুভ্র বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু গণেশ দাদুর কোনো খবর পেলেন?'

'না, এখনো পাওয়া যায়নি। তবে দু-একদিনের মধ্যেই পেয়ে যাব। তোমার দাদু ঘুম থেকে উঠেছেন?'

'জানি না। ওঁর ঘর তো সর্বদাই বন্ধ থাকে। বলাই বলতে পারবে।'

'হুঁ।' বলে মিস্টার ঘোষাল বাড়ির দিকে পা বাড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ বুম্বা জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা মিস্টার ঘোষাল, কিছু মনে করবেন না, উমা পাগ্‌লার মার্ডারটা কদ্দূর এগুলো?'

বেশ গম্ভীর মুখে ভ্রূ কুঁচকে মিস্টার ঘোষাল তাকালেন বুম্বার দিকে। খুব সম্ভব ওনার আঁতে ঘা লেগেছে। তার ওপর একটা পুঁচকে ছোকরা একটা মার্ডার কেস নিয়ে তার মতো জাঁদরেল অফিসারের কাছে প্রায় কৈফিয়ৎ চাইছে, এটা কোনোমতেই মনঃপূত ব্যাপার নয়। উনি 'হবে হবে, ঠিক সময় সব বেরুবে' বলেই হন হন করে বাড়ির দিকে চলে গেলেন।

'যাহ্ ব্বাবা, এতে এত চটার কী হ'ল রে?'

শুভ্র হেসে বলল, 'হবে না? তুমি ওঁর পেশাগত যোগ্যতার টিকি ধরে টান মারবে আর চুপ করে উনি তা শুনে তোমায় হেসে উত্তর দেবেন? কিন্তু তাতনের ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। কাল সারা সকাল মন্দিরে কী দেখল তা একবারও বলল না। কেবল বলল, গণেশ হালদারের পক্ষে আর এখানে থাকা

সম্ভব নয়। এটা নাকি ও আগেই টের পেয়েছিল। তার ওপর দাদুর চিঠির ব্যাপারে মনের মধ্যে এমন একটা খিঁচ ধরিয়ে দিল যে আমি এখন একটা বিরাট ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেছি।'

'চিঠির ব্যাপারটা আমায় একটু বুঝিয়ে বলবি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে আমিও কিছু পারিনি। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছি', বলেই ও দুম্ করে কথা পাল্টে বলল, 'আরে, আমাদের সেই ট্রেনের মিস্টার 'র' না?'

শুভ্রর দৃষ্টি অনুসরণ করে বুম্বাও দেখল, একটা বড় গুঁড়িওলা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন মিস্টার 'র'। বৈশাখের সকাল হলেও সূর্যের দেখা নেই। সম্ভবত রাত থেকেই মেঘ জমেছে আকাশে। গরমটাও বেশ বেড়েছে। ঘামও হচ্ছে প্রচুর। বৃষ্টি নামতে পারে। দূর থেকে মিস্টার র-কে সিল্যুটের মত লাগছিল।

বুম্বা বলল, 'হ্যাঁরে, মনে হচ্ছে মিস্টার 'র'-ই। চল তো দেখি।'

ওরা দ্রুত সেদিকে এগিয়ে গেল। ভদ্রলোক আজ আর ধুতি পাঞ্জাবি পরেননি, পরেছেন ঢিলেঢালা শার্ট প্যান্ট। মাথার টুপিটা না থাকলে চিন্‌তে অসুবিধা হ'ত। পান খাওয়াটা ছাড়েননি। এত সকালেও কচর-মচর করে পান খাচ্ছেন আর এদিক ওদিক পিক্ ছড়াচ্ছেন। ওরা পৌঁছতেই ভদ্রলোক একগাল হেসে বললেন, 'আসেন খোকাবাবুরা। এখোন কী বেড়াতে বেরিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি এখানে, কী ব্যাপার?' সন্দিগ্ধ চোখে শুভ্র প্রশ্ন করল।

'হামি দু এক রোজ বাদ ইখান থেকে চলিয়ে যাবে। হামার ইখানকার কাম শেষ হইয়ে গেছে। তো ভাবলুম কী, ক্লাউডি ওয়েদারমে বেঙ্গলকা ভিলেজ বহুৎ চার্মিং। থোড়া নেচারাল বিউটি এনজয় করিয়ে লিই।'

'বাহ্ দাদা, বাহ্!' বুম্বা বেশ শ্লেষের ভঙ্গীতে বলল, 'বেড়ে গল্প ফেঁদে বসলেন। প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে এসেছেন?'

'হাঁ, জরুর।'

হঠাৎ শুভ্র বলে উঠল, 'সত্যি করে বলে ফেলুন তো আপনি কে?'

'হামি একটা আদমি। হামার নাম মিস্টার রামলোচন সুখাড়িয়া।'

'তার মানে, আপনি একজন অবাঙ্গালি?'

'হামার বহুৎ আফসোস কী হামি বাঙ্গালি হতে পারলুম না।'

'ওসব কথা ছাড়ুন', শুভ্র যেন ক্ষেপে উঠেছে, আপনি যদি বাঙালি না হন তাহলে আপনার হাতে বাংলায় 'র' লেখা কেন? এবং 'রা' লেখা নয় কেন? রামলোচন তো আর 'র' দিয়ে শুরু হয়না?'

রামলোচন আকাশ থেকে পড়লেন, 'ই সব কী বলছেন খোকাবাবু! হামার হাতে বেঙ্গলি অ্যালফাবেটে 'র' লিখা আছে? ই তো বিলকুল ঝুট্।'

'ঝুট? মানে, আমরা মিথ্যে কথা বলছি? বেশ, তুলুন আপনার শার্টের হাতা।' বলে শুভ্র এগিয়ে গিয়ে চেপে ধরল রামলোচনবাবুর বাঁ হাতখানা।

'নেহি খোকাবাবু, ই বাত আচ্ছা নেহি। আপনি হামাকে সাসপেক্ট করছেন? বহুৎ আচ্ছা, তব্ দেখেন—' বলে উনি নিজেই শার্টের হাতা গুটিয়ে দিলেন। শুভ্র আর বুম্বা অবাক। কোথায় উল্কি আর কোথায় কী! পরিষ্কার ধবধবে হাত।

'কী খোকাবাবু, এখোন বিশওয়াস হ'ল তো?'

'ভ্যানিস্?' বুম্বা টিপ্পনি কাটল, 'আপনি ইমিডিয়েট জুনিয়ার পি. সি. সরকারের দলে ভিড়ে যান। নাম করবেন।'

'দিল্লাগী কেনো করছেন খোকাবাবু? হামি তো আপনার সঙ্গে দিল্লাগী করছে না। অব্ হামি যাচ্ছে।'

রামলোচনবাবু অভিমান করে কিছুটা এগিয়ে গেলেন। তারপর কী ভেবে আবার ফিরে এসে বললেন, 'আউর এক খোকাবাবুকে তো দেখছে না! উস্কা তবিয়ত আচ্ছা আছে তো?'

'তা আছে। আচ্ছা রামলোচনবাবু, একটা কথার সত্যি উত্তর দেবেন?'

'জরুর—জরুর। হাম্ সাচ্ বাত্ অলওয়েজ পসন্দ্ করে। পুছিয়ে।'

'তাতন মানে, আমাদের সেই বন্ধু, কাল সকালে বোধহয় আপনার সঙ্গে ছিল, তাই না?'

'ই কোথা কেনো পুছছেন?'

'না, এমনি, হঠাৎ মনে হ'ল। আচ্ছা আপনি এবার আসুন। ও—হ্যাঁ, আর একটা কথা, আপনার দেওয়া ধাঁধাটা আমরা পড়েছি। আমি বা বুম্বা কেউই ওটা সল্ভ্ করতে পারিনি। তবে তাতন মনে হচ্ছে পেরেছে। ওটা দিয়ে আপনি কী বোঝাতে চেয়েছেন?'

হঠাৎ রামলোচনবাবু দার্শনিক হয়ে পড়লেন। বেশ তারিয়ে তারিয়ে বললেন, 'জিন্দেগী এক মজাক খেল্ কি ময়দান! কভি উজালা, কভি আন্ধেরা। উয়ো ধাঁধা, আই মীন পাজ্ল আপনি সল্ভ্ করতে যদি পারেন তো দেখবেন আন্ধেরা আউর উজালাকা আজব খেল্। আউর হামাকে কুছ্ না পুছেন। দোস্তসে পুছ লিজিয়ে। নেহি তো আজ রাততক্ ইন্তেজার কিজিয়ে। বাস্।' বলেই রামলোচনবাবু হন্ হন্ করে চলে গেলেন দু'জনকে বোকা বানিয়ে।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শুভ্র বলল, 'লোকটার মিস্টিক ক্যারেকটার। সাসপেকটেড পার্সনও বটে।'

উত্তরে বুম্বা বলল, 'এখানে এসে আমি অনেক কিছুই বুঝিনি। যেমন বুঝতে পারছি না পর পর দু-তিনটে ঘটনা কেন ঘটল? রামলোচনবাবুই প্রথম বললেন চারিদিকে রহস্য। অথচ তখনো পর্যন্ত রহস্যের টিকিও দেখতে পাইনি। তারপর

হঠাৎ উমা পাগ্‌লা মারা গেল। সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ পড়ল কালীঠাকুরের রত্নহার-এর। সেটা হাপিস হবার সঙ্গে সঙ্গে বহুদিনের পুরনো কর্মচারী গণেশ হালদার নিরুদ্দেশ। সব মিলিয়ে আমার কাছে স্রেফ রহস্য। তেমনি আর একটি রহস্য এই রামলোচনবাবু। লোকটা কে—কোত্থেকে এল—কী করতে চাইছে—বাঙালি না রাজস্থানী? উল্কি হাপিশ? কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আমিও না। চল্‌ দেখি, তাতন ঘুম থেকে উঠল কিনা।' বলে শুভ্র বুম্বার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল রানা চৌধুরীর অন্দরমহলে।

তাতনের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ও বসে ছিল জানলার ধারে চেয়ার টেনে। আজ ওর মুখ নানান অভিব্যক্তিতে ঠাসা। বেশ থমথমে, গম্ভীর অথচ একটা ফিকে উত্তেজনার আভাস। শুভ্র আর বুম্বাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই ও বলল, 'তোরা এসেছিস? ভালোই হ'ল, আমি এখুনি বেরুব। কোথায় কেন জিগ্যেস করিস না। বুম্বা, আমার যতদূর মনে হচ্ছে, সব রহস্যের আজই শেষ রাত। আর এই শেষ রাতে তোর ওস্তাদিটা দেখতে চাই।'

'তার মানে?'

'ঠিক জায়গায়, ঠিক সময়ে, কতটা ক্যারাটে শিখেছিস, আজ তার পরীক্ষা। শুভ্রর কাজ একটাই, তোর দাদুকে লক্ষ্য রাখা। কারণ, রানা চৌধুরীর জীবন বলতে পারিস বিপন্ন।'

'অ্যাঁ!' শুভ্র প্রায় আঁত্‌কে উঠল, 'আর ঠিক এই সময়েই আমরা এখানে। মার কাছে মুখ দেখাব কী করে?'

'সে পরে ভাবা যাবেখন। আমি চললাম।'

'খাবি না?'

'রাস্তায় কোথাও খেয়ে নেব। তোরা রেডি থাকিস। বাগানে থাকব। রাত্রে দেখা হবে। মন্দিরের কাছে। টর্চের সংকেত পেলেই মন্দিরে চলে আসবি।' বলেই তাতন হাওয়া।

॥ তেরো ॥

আর এক গভীর থমথমে রাত। আকাশে চাঁদ নেই। গোলা আলট্রামেরিনের বিরাট বোতলটা কে যেন উপুড় করে ঢেলে দিয়েছে আকাশ আর পৃথিবীর গায়ে। তার ওপর দম আটকানো চাপা গরম। মাঝে মাঝে গুরুগম্ভীর মেঘের ডাক। মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে কাল বৈশাখি শুরু হতে পারে। ঝড় অথবা বৃষ্টি যা হোক একটা কিছু হবেই। খোলা জানালায় দাঁড়িয়ে আছে বুম্বা। তাতন সারাদিন ফেরেনি। বলেছিল, রাত্রে বাগানে থাকবে। টর্চ জ্বালিয়ে সংকেত পাঠাবে। বাগানে গাছপালার মধ্যে দিয়ে মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমক। এছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

বিদ্যুতের চমক থেমে গেলেই মনে হচ্ছে, জানলার বাইরে কে যেন একটা কালো পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছে। টর্চ জ্বেলে সংকেত পাঠালেও ঐ ঘন অন্ধকার ভেদ করে আলো এসে পৌঁছবে কিনা সন্দেহ। তাতন বলেছিল, আজ বুম্বার খেল্। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বুম্বা ভেতরে-ভেতরে তাই বেশ উত্তেজিত।

ওদিকে সেই তিন সেন্টিমিটার দরজা ফাঁক রেখে শুভ্র ঠায় বসে আছে। তীক্ষ্ণ আর সজাগ দৃষ্টি ফেলে রেখেছে বারান্দায়। উৎকর্ণ কান দুটি রয়েছে শরীরী অথবা অশরীরী কিছুর প্রতীক্ষায়।

মনে মনে সেও বেশ উত্তেজিত। তাতন বলেছে, চৌধুরীবাড়ির সব রহস্যের মীমাংসা আজ হয়ে যাবে। রহস্য কী তা ও নিজেও জানে না। তবে অপরাধ দুটো ঘটেছে। উমা পাগ্‌লার খুন হওয়া আর রত্নহার সমেত গণেশ হালদারের নিখোঁজ হওয়া। এই দুটো ঘটনার মধ্যে কোনো যোগাযোগ আছে কিনা সে সম্বন্ধে শুভ্রর কোনো ধারণাই নেই। যদি থাকে সেটাই রহস্য। কারণ আগে খুন, পরে গণেশ হালদার নিখোঁজ। অবশ্য রত্নহার হারানোর কোনো নির্দিষ্ট দিনক্ষণ জানা যায়নি।

এই সব নানান এলোমেলো চিন্তায় শুভ্র যেই একটু অন্যমনস্ক হয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা অস্পষ্ট এবং ক্ষীণ 'ক্যাঁচ' শব্দ হতেই ওর সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল। বারান্দার লাগোয়া পর পর চারখানা ঘরের যে কোনো একটার দরজা খোলার আওয়াজ বলেই মনে হ'ল। শুভ্র ফিসফিস করে বলল, 'বুম্বা, বি রেডি। দরজা খোলার একটা স্পষ্ট আওয়াজ পেলাম।'

ঘরে কোনো আলো ছিল না। বাইরের মিশমিশে অন্ধকারটা জানলা খোলা পেয়ে যেন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তার ওপর বুম্বা আর শুভ্র দু'জনেই ডার্ক কালার শার্ট আর কালো প্যান্ট পরেছে। তাই ওরা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। আন্দাজে, ঘরের সব আসবাবপত্রের পাশ কাটিয়ে বুম্বা গিয়ে বসল শুভ্রর পাশে। আবার ফিসফিস করে শুভ্র বলল, 'ভালো করে ঠাহর কর তো, কিছু দেখতে পাস কিনা।'

অন্ধকার সয়ে গিয়েছিল। তাই বারান্দা দেখতে তেমন অসুবিধা হ'ল না। প্রথমে কাউকে দেখতে না পেলেও সহসা দু'জনেই চমকে উঠল। হ্যাঁ, কে যেন রানা চৌধুরীর ঘরের দিক থেকে হেঁটে আসছে পা টিপে টিপে। অনেকটা চোরের মতো। তারপর শুভ্রদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ ছায়ামূর্তি ওদের ঘরের দিকে এগিয়ে এল। নিমেষে বুম্বা তিন সেন্টিমিটার ভেজিয়ে দিয়ে নিজের পিঠ চেপে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দরজায় কান পেতে।

হ্যাঁ, যা ভেবেছিল ঠিক তাই। ছায়ামূর্তি দরজায় স্বল্প জোরে ধাক্কা দিল। তারপরই সব চুপচাপ। ক' সেকেন্ডই বা হবে! মনে হচ্ছিল যেন কতক্ষণ না জানি কেটে গেছে। আবার একটা শব্দ। খুব চাপা। শুভ্র বা বুম্বার বুঝতে অসুবিধা হ'ল না

যে সেটা বারান্দার দরজা খোলার ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট আওয়াজ। ওরা আবার দরজা ফাঁক করল। সেই রহস্যময় ছায়ামূর্তি বারান্দার দরজা খুলে তরতর করে নিচে নেমে যাচ্ছে।

এক লহমার মধ্যে ওরা ওদের কর্তব্য স্থির করে নিল। তাতনের সংকেতের জন্যে ওরা আর অপেক্ষা করতে পারল না। এমন কী, তাতন বার বার বলে দিয়েছিল রানা চৌধুরীকে চোখের আড়াল করা যাবে না। সেকথাও ওরা ভুলে গেল। আসলে ঠিক সেই মুহূর্তে ঐ রহস্যময় লোকটিকে ওরা হাতছাড়া করতে পারল না। দু'জনের হাতে একমাত্র টর্চ ছাড়া আর কোনো অস্ত্র বা ঐ জাতীয় কিছু সঙ্গে ছিল না। কালবিলম্ব না করে ওরাও সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল। হ্যাঁ, ঐ তো দেখা যাচ্ছে লোকটাকে। অন্দরমহল পার হয়ে বারমহলের দিকে এগিয়ে চলেছে। বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা। খুব সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে। বারমহল পার হয়ে লোকটা বড় দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর চকিতে পিছন ফিরে তাকাল। বুম্বা আর শুভ্র এ ব্যাপারে সজাগই ছিল। এমন অবস্থায় যে কোনো লোক পিছন ফিরে একবার তাকাবেই। ওরা ততক্ষণে বড় থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে। চাপা স্বরে একবার বুম্বা জিগ্যেস করল, 'লোকটা কে রে?'

'জানি না।'

'বলাই নয় তো?'

'বলাই অনেক বেঁটে। এ তো রীতিমতো লম্বা।'

'কিন্তু লোকটা ওপরে গেল কী করে?'

'আমার মনে হচ্ছে চৌধুরীবাড়িতে কোনো গুপ্ত রাস্তাটাস্তা আছে।'

'কিন্তু মতলবটা কী? যাচ্ছে কোথায়? আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে, বুঝলি শুভ্র?'

'কী?'

'তোর ছোট দাদু নয় তো মানে রমেন্দ্র চৌধুরী? উনিও তো প্রায় ওই রকমই লম্বা-চওড়া।'

'কিন্তু এ মহলে উনি আসবেন কী করে?'

'ঐ জন্যেই তো বললুম, এ মহল ও মহলের মধ্যে কোন গুপ্ত রাস্তা নিশ্চয় আছে। আগেকার দিনের জমিদার বাড়িতো।'

'কী জানি রে, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। দাদুর ঘরে একবার যেতে পারলে ভালো হ'ত।'

ততক্ষণে সামনের লোকটা দরজা খুলে বাগানে গিয়ে পড়েছে। রানা চৌধুরীর খোঁজ নেবার আর অবসর হল না। বাগানে নেমেই লোকটা হনহন করে মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলল। শুভ্র আর বুম্বাও সমান ব্যবধান বজায় রেখে তাকে অনুসরণ করে চলল।

বেশী দূর যেতে হ'ল না। মন্দিরের সামনে এসেই লোকটা থেমে পড়ল। এক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়াল। একবার পিছন ফিরেও তাকাল। তারপর নিমেষেই মন্দিরের মধ্যে ঢুকে গেল।

কিন্তু মুশকিল হ'ল তখনই। শুভ্র আর বুম্বা ওখানে পৌঁছে দেখল মন্দিরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। এমনটা যে হবে তা ওরা আগে থেকে আঁচ করতে পারেনি। চকিতে দু'জন দু'জনের দিকে তাকাল। উদ্দেশ্য, এখন কী করা? একবার ভাবল, মন্দিরের পিছন দিক থেকে যদি কোনোভাবে মন্দিরে ঢোকা যায়। কারণ ওরা বুঝে নিয়েছে রহস্যময় লোকটির উদ্দেশ্য মন্দিরের সুড়ঙ্গ পথে যাওয়া। তাছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যই থাকতে পারে না।

হঠাৎ একটা 'খুট' শব্দ শুনেই ওরা দু'পাশে সরে গেল। দু'জনেই প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তেমনি বেগতিক দেখলে ওরাও ছেড়ে কথা বলবে না।

'কোনো কথা না বলে তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে আয়।'

ওরা নিশ্চিন্ত হ'ল।

তাতনের গলা। ভেতর থেকে মন্দিরের দরজা ও-ই খুলে দিয়েছে।

চটপট ওরা ভেতরে ঢুকে গেল।

'তুই এখানে?' বুম্বা জিগ্যেস করল।

'লোকটার জন্যে অনেকক্ষণ আগে থেকেই অপেক্ষা করছি।

চিনতে পারলি লোকটাকে?' আবার তাতনের গলা।

'নাহ্, যা অন্ধকার!' শুভ্র উত্তর দিল।

'এখুনি চিনতে পারবি। এবার চল।'

'কোথায়?'

'সুড়ঙ্গ পথে। লোকটা ওখানেই গেছে।'

'কিন্তু—' শুভ্র একটু দোনামোনা করতে চাইল।

'এখন 'কিন্তু' বলে কোনো কথা থাকতে পারে না। বুম্বা, বি রেডি ফর এ স্ট্রেট ফাইট।'

নিকষ কালো অন্ধকারের সঙ্গে কালীঠাকুরের গায়ের রঙ মিশে গেছে। কালীমূর্তিকে দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না। টর্চের আলো ফেলল তাতন। চকচক করে উঠল মূর্তি। অন্ধকারে এ মূর্তি দেখলে বেশ ভয়ই লাগে। গা শিরশির করে ওঠে। কিন্তু থ্রী মাস্কেটিয়ার্সের কাউকেই ভয় পেতে দেখা গেল না। ওরা এগিয়ে গেল। তাতনই গিয়ে মূর্তির সিংহাসনের নিচে পাথরটিতে সজোরে চাপ দিল। ঘুরে গেল মূর্তি। দেখা দিল সুড়ঙ্গ পথ। প্রথমে তাতন, তারপর শুভ্র আর বুম্বা একে একে নেমে গেল।

সিঁড়ি শেষ হতে আরম্ভ হ'ল ভিজে মাটি। আজ তিনজনের পায়েই নর্থস্টার।

পরনে মোটা জিন্স্। সাপ-বিছের ভয় থাকলেও পায়ে কিছু ফোটার ভয় নেই। মাঝে মাঝে ওরা আলো জ্বালাচ্ছিল। মাথার ওপর থেকে বটের ঝুরি নেমেছে। সামান্য দূরে ভিজে মাটির দেয়াল। সেদিনের মতো আজ আর কোনো মানুষের গলার চাপা আওয়াজ ভেসে আসছিল না। তবু তাতনের যেন সব মুখস্থ। সোজা সামনের দিকে এগিয়ে চলল। সেই লোকটিকে এখন কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তবে তাতনের হাবভাব দেখে মনে হয়, ও জানে লোকটিকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে। কিছুদূর গিয়ে একটা দেয়ালের সামনে ও দাঁড়িয়ে পড়ল। টর্চ জ্বেলে খুব মন দিয়ে দেয়ালের একটা বিশেষ অংশ খুঁটিয়ে দেখলো।

চাপাস্বরে শুভ্র জিগ্যেস করল, 'কী দেখছিস?'

'মার্ক। একটা চিহ্ন রেখে গিয়েছিলাম।'

'তার মানে, তুই এর আগে এখানে এসে সব গুছিয়ে রেখেছিস।'

'আজ প্রায় সারাদিন তো এর মধ্যেই ছিলাম। এই তো পেয়েছি।'

তাতন এগিয়ে গিয়ে ভিজে মাটির দেযাল থেকে একটা পিন্ তুলে আনল।

'তা নয় বুঝলাম,' গম্ভীর হয়ে বুম্বা বলল, 'এরপর?'

'এরপর? পুরনো জমিদারী কেলেঙ্কারীর নমুনা দেখ্। কত অপরাধ আর কুকীর্তি যে এখানে জমা হয়ে আছে!'

বলেই ও মাটির ওপর উবু হয়ে বসে পড়ল। তারপর দু'হাত দিয়ে ভিজে মাটি সরাতে শুরু করল।

'কী করছিস রে?' শুভ্রর কণ্ঠে বিস্ময় আর কৌতূহল।

'তোদের পূর্বপুরুষ, আই মীন, তোর মায়ের পূর্বপুরুষদের কীর্তি নিজের চোখেই দেখ।'

ততক্ষণে আলগা মাটির বেশ কিছু সরানো হয়ে গেছে। অনেকটা হাইড্রান্টের ঢাকনার মতো একটা লোহার চাকতি বেরিয়ে এল। তবে এই চাকতির ওপর জাঁতাকলের মতো ছোট্ট একটা হাতল লাগানো ছিল। হাতলটা চেপে ধরে তাতন সেটা ঘোরাতে শুরু করল। বেশ কয়েকটা পাক খাবার পর সামনের দেয়ালে একটা চৌকো গর্ত দেখা গেল। গর্তটা আর কিছুই নয়, দেয়াল দু'হাত পিছনে সরে গেছে। একজন মানুষ ভেতরে ঢোকার মতো পরিসর সৃষ্টি হয়েছে।

বুম্বা মন্তব্য করল, 'এখানেও আলিবাবার ভোজবাজি!'

তাতন কোনো উত্তর না দিয়ে দু'দেয়ালের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। দেখাদেখি শুভ্র আর বুম্বাও ভেতরে চলে এল। এখানেও বুনো গাছগাছালি আর বটের ঝুরি। অন্ধকার একই রকম। মাঝে মাঝে মাটির ওপর আলো জ্বেলে ওরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

খুব শীত করছিল ওদের তিনজনেরই। একটু পরেই বুম্বা বলল, 'উঃ, যা ঠাণ্ডা

না! হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে! কে বলবে এখন বৈশাখ মাস!

'পাতালপুরী। ঠাণ্ডা তো হবেই।'

চলতে-চলতে শুভ্র জিগ্যেস করল, 'হ্যাঁরে তাতন, গরমকালে তো ভূমিকম্প হয়!'

'হতে পারে। তা হঠাৎ ভূমিকম্পের প্রশ্ন কেন?

'এই সময় ভূমিকম্প হলে আর কোনোদিনও বেরুতে পারব না।'

বুম্বা হাসল। তাতন কোনো উত্তর দিল না। ও বুঝতে পারল শুভ্র মনে মনে বেশ ভীত হয়ে পড়েছে। হঠাৎ একটা তীব্র চিৎকারে ওরা তিনজনেই সজাগ হয়ে সামনের দিকে তাকাল। ছোট একটা মাটির ঘর। ভেতরে আলো জ্বলছে।

'না না না, কক্ষণো না। কিছুতেই আমি বলব না।' পুরুষ-মানুষের কণ্ঠস্বর।

'আজ তোমাকে বলতেই হবে।' অপর একটি পুরুষ-কণ্ঠ সমান তালে চিৎকার করে উঠল, 'অনেকদিন থেকে তোমায় আমি সময় দিয়ে এসেছি। এখনো বলছি, ভালো চাও তো—'

'চুপ কর্ কুকুর কোথাকার! তুই আমাকে ভালো-মন্দর ভয় দেখাচ্ছিস? কী করবি তুই? কী তুই করতে পারিস?'

'দেখবে কী করতে পারি? ডাক্তার—'

একটা তীব্র আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ল পাতালপুরীর দেয়ালে-দেয়ালে। ওরা নিঃশব্দে ছুটে গেল ছোট্ট ঘরটার কাছে। ভেজানো দরজা। একটা মাত্র জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল, জানলার দিকে পিছন ফিরে মাটির ঢিপির ওপর বসে আছে একজন লোক। তার পাশে দণ্ডায়মান আর একজন। অদূরে বড় আকারের হ্যারিকেন জ্বলছে। হ্যারিকেনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। স্বল্প আলোয় তার মুখ দেখেই চম্‌কে উঠল বুম্বা আর শুভ্র। বুম্বার মুখ থেকে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বের হ'ল, 'এ কী রে! এ কী দেখছি! এ যে রানা চৌধুরী! উনি না অসুস্থ?'

বাকি দু'জন কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করেই রইল। রানা চৌধুরীর চোখ-মুখ তখন ভীষণ আকার ধারণ করেছে। তিনি বেশ উত্তেজিত। চিৎকার করে উঠলেন, 'বলবে না?'

'না।'

'কেন? কেন বলবে না? কী হবে ওটা তোমার কাছে রেখে? ক'দিন ওটা তুমি ভোগ করতে পারবে?'

'কুলাঙ্গার! তুই একটা কুলাঙ্গার, তাই এসব বলতে পারছিস! স্বার্থপর, লোভী, বেইমান কোথাকার! বংশের মান-ইজ্জত কিছুই নয় তোর কাছে?'

'বংশ? ফুঃ! আপনি বাঁচলে বাপের নাম। ওসব কথা ছাড়। বল, কোথায়

রেখেছ সেটা, নইলে—'

'কী করবি? উমার মতো খুন করবি? তাতে আমি ভয় পাই না। পৃথিবীতে মাত্র একটা লোকই জানে, মানে আমার বিশ্বাস, সে-ই খুঁজে বার করতে পারবে কোথায় আছে সেটা। অন্ততঃ এমন ব্যবস্থা করে গেছি, আমি মরে গেলেও সেটা তোর হাতে পৌঁছবে না। এত বড় শয়তান তুই যে শেষ পর্যন্ত নিরীহ একটা লোককে খুন করলি?'

'বেশ করেছি। শালা উমা পাগ্‌লা। আবার বলে কিনা সবার কাছে আমার কথা ফাঁস করে দেবে। স্যাযনা পাগলকে খতম করে দেওয়াই উচিত। এখনও বলছি, যদি আমার তিন গোনার মধ্যে না বল, তাহলে তোমার অবস্থা উমা পাগলার থেকেও খারাপ হবে। উমা পাগলা মরে বেঁচেছে, তোমাকে পাগল হয়ে এই পাতালপুরীতে তিল তিল করে বাঁচতে হবে। বল, কুইক, হাতে আমার একমুহূর্ত সময় নেই, এক...দুই...তিন...। ঠিক আছে, ডাক্তার, দাও ওকে ইনজেকশান।'

ডাক্তার মুখার্জি, মানে, যে লোকটা পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, তার হাতে ইনজেকশানের সিরিঞ্জ তৈরিই ছিল। সিরিঞ্জটা তুলে নিয়ে ডাক্তার বলল, 'বলাই, চেপে ধর, ভালো করে।'

বলাই বোধহয় এতক্ষণ ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল। ওকে দেখতে পাওয়া যায়নি। ডাক্তারের ডাকে উঠে এল। শক্ত করে চেপে ধরল মাটির বেদীর ওপর বসে থাকা লোকটিকে। হঠাৎ লোকটি চিৎকার করে উঠল, 'না-না, ও ইনজেকশন আমায় দিও না। মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হয়। দিও না, দিও না বলছি—

ততক্ষণে ডাক্তার ঝুঁকে পড়েছে সিরিঞ্জ নিয়ে। বুম্বা একবার তাকালো শুভ্র আর তাতনের দিকে। তাতনকে লক্ষ্য করে চাপা স্বরে বলে উঠল, 'কী করবি তাতন?'

কিন্তু তাতন কিছু উত্তর দেবার আগেই ভোজবাজি ঘটে গেল। ঘরের মধ্যে যেন বাজ পড়ল। একটা গম্ভীর এবং ভরাট কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'সিরিঞ্জটা সরিয়ে নাও ডাক্তার, নইলে—আমার হাতের লক্ষ্য কখনও ফস্‌কায় না।'

বিস্ময়ের পর বিস্ময়। শুভ্র আর বুম্বা দেখল, মিস্টার 'র' যেন কোত্থেকে মাটি ফুঁড়ে উঠে এসেছেন। তাঁর হাতে উদ্যত রিভলবার।

আচমকা এমন একটা ঘটনার জন্যে ঘরের কেউই প্রস্তুত ছিল না। মুহূর্তের জন্যে সবাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা মাত্র মুহূর্তের জন্যে। বিহ্বলতা কাটিয়ে রানা চৌধুরী গর্জন করে উঠলেন, 'কে? কে তুই? এখানে কী করে এলি?'

মিস্টার 'র' হাসতে হাসতে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে স্পষ্ট বাংলায় বললেন, 'ভাষাটাকে ভদ্র করুন মিস্টার চৌধুরী। কোনো ভদ্রলোক অন্য একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রথম দেখায় এমন সম্ভাষণ কী করতে পারেন?'

'চুপ কর্ শয়তান কোথাকার! কে তোকে এখানে নিয়ে এল? এ রাস্তা তুই চিনলি কী করে?'

'বলব। পরে সব বলব—আমি কে, কী করে এলাম। তবে তার আগে দুটো কাজ করতে হবে। আপনাদের মতো কয়েকটা শয়তানকে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া, আর ঐ ভদ্রলোককে এখান থেকে মুক্ত করে নিয়ে যাওয়া।'

'তবে রে কুত্তা! তোর সাহস তো মন্দ নয়! বাঘের গুহায় এসে তাকে তুই ভয় দেখাচ্ছিস? তোকে এখানে পুঁতে রাখলেও পৃথিবীর কোনো লোক টের পাবে না তা জানিস?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারেন।'

'তবে রে!'

বলেই সত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধ রানা চৌধুরী মিস্টার 'র' এর হাতে ধরা রিভলভার উপেক্ষা করে ঠিক বাঘের মতোই ঝাঁপ দিলেন তাঁর ওপর।

ব্যস্, ঘটে গেল তুলকালাম কাণ্ড। তাতন, বুম্বা আর শুভ্র ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে ঘরটার মধ্যে। তাতন ঝাঁপ দিয়েছে বলাই-এর ওপর। আর বুম্বা ডাক্তারের মোকাবিলা করতে ব্যস্ত হ'ল। শুভ্র রইল একপাশে দাঁড়িয়ে। প্রয়োজনে ও আসরে নামবে। ঠিক পাঁচ মিনিট। ঘরের সমস্ত দৃশ্যটাই গেল পাল্টে। বলাই আর ডাক্তার থ্রী মাস্কেটিয়ার্সের হাতে পিছমোড়া অবস্থায় বাঁধা পড়েছে। মিস্টার-'র'-এর রিভলভার তখন রানা চৌধুরীর কণ্ঠদেশ চেপে ধরেছে। তাঁর আর নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। প্রথমে মিস্টার 'র'-এর গলা পাওয়া গেল, 'স্যরি মিস্টার চৌধুরী, আমার ব্যবহারে আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু এছাড়া আর আমার কোনো উপায় ছিল না।'

এরপর মিস্টার র তাতনকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, 'তাতন, বাইরে গিয়ে খুব জোরে তিনবার বাঁশী বাজা। ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।'

তাতন বেরিয়ে গেল। বুম্বা আর শুভ্র অবাক হয়ে মিস্টার র-এর দিকে তাকিয়ে আছে। মিস্টার র বললেন, 'শুভ্র, তোমার দাদু খুবই অসুস্থ, ওঁর পাশে গিয়ে বস।'

'কিন্তু উনি তো—'

'না শুভ্র, আমার হাঁটুর নিচে যে লোকটি পড়ে আছেন তিনি তোমার দাদু নন। তোমার দাদু উনি। একই রকম দেখতে হলেও, ইনি মেকআপ করেছেন, আর উনি আসল।'

বুম্বা আর থাকতে না পেরে বলল, 'তাহলে উনি কে?'

তাতন ঘরে ফিরে আসতে-আসতে বলল, 'মন্দিরে দেবীর সিংহাসনের নিচে যে 'র' লেখা আংটি পেয়েছিলি এঁর হাতে পরিয়ে দেখ, ঢিলে হবে না। উমা পাগ্‌লার হাতে যার মাথার কালো কোঁকড়ানো চুল পাওয়া গিয়েছিল, উনিই তিনি।'

হঠাৎ এক ঝটকায় মিস্টার র নকল রানা চৌধুরীর চুল আর গোঁফদাড়ি টেনে খুলে দিলেন, 'দেখ কেমন সুন্দর চকচকে কোঁকড়ানো কালো চুল। শুভ্র, তুমিও চিনলে না এঁকে?'

মাটির ঢিপির ওপর বসে থাকা আসল রানা চৌধুরী এতক্ষণ মাথা নিচু করে বসে ছিলেন। হঠাৎ আদর করে শুভ্রকে পাশে টেনে নিয়ে বললেন, 'ও কেমন করে চিনবে? ও কী আর কোনোদিনও দেখেছে ঐ কুলাঙ্গারটাকে? রজতেন্দ্র চৌধুরীর নাম শুনেছ?'

'হ্যাঁ, আমার মেজো মামা।'

'ও-ই রজতেন্দ্র। তোমার মা প্রতিমার মেজদা। এই হতভাগ্য লোকটা ওর বাবা।'

'কিন্তু উনি তো জার্মানীতে ছিলেন—'

'সে সব অনেক কথা। পরে শুনো। কিন্তু গণেশ, গণেশ গেল কোথায়?'

উত্তরটা দিলেন মিস্টার র, 'গণেশবাবু এখন সুস্থই আছেন। ওঁকে আমি লোক দিয়ে ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

শুভ্র জিজ্ঞাসা করল, 'ওঁর কী হয়েছিল?'

'তোমার মেজো মামা ওকে আর বাঁচিয়ে রাখতে চাইছিলেন না।'

'কেন?'

'যতই উনি ঘর অন্ধকার করে অসুখের অজুহাত দেখিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকুন না কেন, গণেশ হালদারের মতো প্রবীন লোকের চোখে তা ধরা পড়ে যায়। গণেশ হালদার রজতেন্দ্র চৌধুরীকে শাসিয়েছিল, আসল রানা চৌধুরীকে কালীপুজোর আগে বার করে না আনলে সব কথা পুলিসকে জানিয়ে দেবে। তা তার শাস্তি মৃত্যু ছাড়া আর কী হতে পারে? কী মিস্টার রজতেন্দ্র চৌধুরী, ঠিক বলছি তো? গণেশ হালদারকে আজই তো শেষ করার কথা ছিল, তাই না?'

রজতেন্দ্র চৌধুরী তখনও গর্জাচ্ছেন, 'তোমাকে আমি দেখে নোব শয়তান!'

'তার বোধ হয় আর সময় পাবেন না।' বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন দারোগা শিবদাস ঘোষাল। সঙ্গে প্রায় জনা আস্টেক কনস্টেবল। মিস্টার ঘোষালের হাতে উদ্যত পিস্তল। ওঁকে দেখে মিস্টার 'র' উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'মিস্টার ঘোষাল, এই নিন আপনার আসল অপরাধী। অন্য অপরাধগুলো বাদ দিলেও উমা পাগলার হত্যাকারী হিসেবে একে গ্রেপ্তার করতে পারেন। আমার পকেটে একটা মিনি টেপ আছে। এঁর স্বীকারোক্তি।'

'থ্যাঙ্কস ফর ইওর কোঅপারেশন।'

মিস্টার 'র' এগিয়ে এসে রাঘবেন্দ্র চৌধুরীর হাত ধরে তুললেন, 'চলুন, এখানে বড্ড ঠাণ্ডা, এই বয়েসে এত ঠাণ্ডা লাগানো ভালো নয়।'

'হ্যাঁ তাই চলুন। এই বুড়োটা আপনাকে অনেক কষ্ট দিল। জানেন মিস্টার—'

দাদুর কথায় বাধা দিয়ে শুভ্র বলে উঠল, 'দাঁড়ান দাদু, ওঁর নামটা আমাকেই বলতে দিন। যে লোককে আমি একবার দেখি তাঁকে কখনোই ভুলতে পারি না। তাতন আমাকে খবরের কাগজে একটা ছবি দেখিয়েছিল, গোয়েন্দা নীল ব্যানার্জির। তারপর মিস্টার 'র'-এর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি কী ভুল করছি যে আপনি নীল কাকু নন?'

একটানে নিজের নকল চুল আর গোঁফ টেনে ফেলে দিয়ে নীল ব্যানার্জি বলল, 'না শুভ্র, তুমি ঠিকই ধরেছ, আমিই নীল ব্যানার্জি। তবে বড্ড দেরিতে ধরলে।'

'কী করব, খবরের কাগজে ছাপা ছবি দেখে একজন ছদ্মবেশে থাকা লোককে আইডেন্টিফাই করা শক্ত বৈকি।'

'রাইট, রাইট। চল, এবার ওপরে ওঠা যাক।'

ততক্ষণে দারোগা মিস্টার ঘোষাল কনস্টেবল সমেত রজতেন্দ্র চৌধুরী, ডাক্তার মুখার্জি আর বলাইকে নিয়ে ওপরে উঠে গেছেন।

নীল ব্যানার্জি আর শুভ্রর কাঁধে ভর দিয়ে রানা চৌধুরী এগুতে-এগুতে বললেন, 'কিন্তু আমার ধাঁধা?'

মৃদু হাসতে-হাসতে নীল বলল, 'ওটা সল্‌ভ্ করতে না পারলে কী আর আপনাকে এখান থেকে উদ্ধার করতে পারতাম?'

'তাহলে আমার কালীমায়ের রত্নহার?'

'যেখানে রেখেছিলেন সেখানেই আছে।' আপনার ধাঁধার উত্তর 'তানপুরাটার খুললে ডালা মিলে যাবে রতনমালা', তাই না?'

'আপনি সত্যিই বুদ্ধিমান। এ ছাড়া আর আমার কোনো উপায় ছিল না। হতচ্ছাড়া ছেলেটা বুঝতে পেরেছিল গুপ্ত সিন্দুকটা কোথায় আছে। তাই ও কিছু করার আগেই আমি আমার স্ত্রীর পরিত্যক্ত তানপুরাটা খুলে ওর লাউ-এর মধ্যে হারটা রেখে দিয়েছিলাম। ইচ্ছে করেই ওটা ওই রকম একটা সাধারণ জায়গায় রেখেছিলাম যাতে চট্ করে কেউ খুঁজে না পায়।'

হঠাৎ তাতন বলল, 'কিন্তু দাদু, একটা জিনিস আপনি ভুল করেছিলেন।'

'কী ভাই?'

'তানপুরার মুখ বন্ধ করার জন্যে যে ফেভিকলটা ব্যবহার করেছিলেন তার টিউবটা আপনার পালঙ্কের তলাতেই পড়ে ছিল।'

মৃদু হেসে রানা চৌধুরী বললেন, 'কী করব বল ভাই, আমি তো আর ঝানু গোয়েন্দা নই।'

নীল হঠাৎ তারিফ করতে করতে বলল, 'আপনার ধাঁধাটা কিন্তু বেশ কঠিন।'

পূর্বের হাসি বজায় রেখেই রানা চৌধুরী বললেন, 'তাই বলে আপনার কাছে নয়।'

'আরো একজনের কাছেও কিন্তু ধাঁধা সল্‌ভ্‌ড্‌।'

'সেকি! কে সে?'

তাতনকে দেখিয়ে দিল নীল, 'ও। ও কিন্তু ধরে ফেলেছে।'

তাতনের দিকে তাকিয়ে রানা চৌধুরী বললেন, 'সে তো হবেই। গোয়েন্দার চেলা, সেও তো মিনি গোয়েন্দা।'

॥ চোদ্দ ॥

নীলকে কালীপুজো পর্যন্ত ধরে রাখা গেল না। ওর হাতে নাকি আর একটা ইন্টারেস্টিং কেস ঝুলছে। তবে একটা দিন থাকতেই হয়েছে রাঘবেন্দ্রর বিশেষ অনুরোধে। নীলকে সাক্ষী রেখে রাঘবেন্দ্র পারিবারিক নিয়ম ভেঙ্গে, রত্নহারের পরবর্তী উত্তরাধিকারী, অর্থাৎ রমেন্দ্রনারায়ণের পুত্র রসেন্দ্র নারায়ণের হাতে তিনি রত্নহারের মালিকানা তুলে দিয়েছেন। সন্তান যতই কু-পুত্র হোক, পিতৃস্নেহ এক মারাত্মক ব্যাধি। এ ব্যাধি পিতাদের নিস্কৃতি দেয় না। রজতের জন্যে সত্যিই তিনি ভেঙ্গে পড়েছেন।

যে কালীপুজো দেখার জন্যে 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্সের' ময়নাডাঙ্গায় আসা, সেটাও দেখা হল না ওদের। নীলের সঙ্গ ওরা কেউ ছাড়তে চাইল না। আসলে চৌধুরী বাড়ির এ মহলটা একেবারেই ফাঁকা হয়ে গেল। বলাইকে পুলিস অ্যারেস্ট করেছে। তার মা সরলা সেই শোকে আর নিজের ঘর ছেড়ে বেরুচ্ছেনা। থাকার মধ্যে দুই বৃদ্ধ। প্রভু এবং ভৃত্য। এ অবস্থায় রাঘবেন্দ্রও আর ছেলে তিনটেকে আটকালেন না।

শুভ্র আর বুম্বা তো এখন রীতিমত নীলের ভক্ত। কথা হচ্ছিল ফিরতি ট্রেনের কামরায় বসে। সন্ধের ডাউন গাড়ি। তায় ফার্স্ট ক্লাশ। কামরায় ওরা ছাড়া আর কেউ নেই। বুম্বাই প্রথম কথা শুরু করল, 'আচ্ছা নীলকাকু, এবার বলুন তো, কী করে কী করলেন? সমস্ত ব্যাপারটাই এখনও বেশ জট পাকিয়ে আছে।'

একটা ফিলটার উইলস্ ধরিয়ে নীল বেশ জমিয়ে বসল। তিন ঘণ্টার জার্ণি। তার ওপর আসার সময়ে রমেন্দ্রনারায়ণের বাড়ি নেমন্তন্ন সেরে আসতে হয়েছে। খাওয়াও হয়েছে প্রচুর। একটু গল্প না করলে হজমও হবে না।

নীল শুরু করল, 'রত্নহার রহস্য নিয়ে তোদের মধ্যে অনেক প্রশ্ন জমে আছে সে আমি জানি। মোটামুটি আমি একটা জিস্ট তৈরি করেছি। দেখবি সব জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে। শুরু হয় একটা চিঠি দিয়ে। রাঘবেন্দ্র চৌধুরী আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন। তাতে উনি লিখেছিলেন ওঁর জীবন বিপন্ন। যে কোন

মুহূর্তে তাঁর মৃত্যু ঘটতে পারে। এবং সেটা স্বাভাবিক মৃত্যু হবে না। আর তার কারণ একটি দুষ্প্রাপ্য রত্নহার। চৌধুরী বংশের পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্য এবং মানসম্ভ্রম লুকিয়ে আছে ঐ রত্নহারের মধ্যে। মূল্যবান ঐ হারের লোভে একজন ওঁর জীবন বিপন্ন করে তুলেছে। নামটা বলেননি। খুবই স্বাভাবিক। সেই কুকর্মের নায়ক ওঁর নিজের সন্তান। কে আর চায় বল নিজের সন্তানের কুকীর্তি ঢাকঢোল পিটিয়ে জাহির করতে। কিন্তু পারিবারিক সম্পদ যাতে কোন অমানুষের হাতে না পড়ে সেই কারণে উনি হারটি একটি গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখেন। ওঁর যদি কিছু হয়ে যায়, আমি যেন সেই হারটি গোপন স্থান থেকে উদ্ধার করে ঐ হারের পরবর্তী জিম্মাদার রমেন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র রসেন্দ্রনারায়ণ, যে নাকি বর্তমানে চৌধুরীদের সব ছেলেমেয়েদের থেকে বয়ঃজ্যেষ্ঠ তার হাতে তুলে দিই। চিঠির সঙ্গে তিনি একটি ছড়া আর কিছু এলোমেলো এবং আপাত অর্থহীন শব্দমালাও পাঠিয়ে ছিলেন। ছড়াটি সূত্র। আর এলোমেলো শব্দগুলোর মধ্যে লুকনো স্থানের হদিশ লুকিয়ে আছে। তিনি আরও বলেছিলেন আমি যদি কোনক্রমে ধাঁধার উত্তর না পাই তাহলে পুরো ধাঁধা এবং সূত্র যেন রসেন্দ্রনারায়ণের কাছে পাঠিয়ে দিই।

'কিন্তু,' বলে বুম্বা মাঝ পথে নীলকে থামাল।

'হ্যাঁ, বল। কিছু খট্‌কা লাগছে?'

'পৃথিবীতে এত লোক থাকতে বেছে বেছে উনি আপনার কাছে চিঠি দিলেন কেন?'

নীল সামান্য হাসল। একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'তাতনের মুখে যখন আমি খবর পাই তোরা ময়নাডাঙ্গা যাচ্ছিস চৌধুরীবাড়ির কালী পুজা দেখতে সে সময় তাতনকে আমি জানাইনি যে আমি তোদের আগেই ওখানে আমন্ত্রিত। আসলে রাঘবেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে আমার আগে থেকে কোন পরিচয় ছিল না। উনি ওনার সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন আমার জামাইবাবু ডি.এস.পি সত্যেন মুখার্জীকে। সব শুনে সত্যেনদা চৌধুরী সাহেবকে জানান, যেখানে প্রত্যক্ষ কোন ক্রাইম ঘটেনি, সেখানে সরকারি ভাবে একজন মানুষের আশঙ্কাকে সম্বল করে পুলিস কোন ডাইরেক্ট অ্যাকশান নিতে পারে না। বড় জোর কয়েকটা পুলিস পোস্টিং করতে পারে। এক্ষেত্রে কোন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের সাহায্য নেবার পরামর্শ দেন এবং আমাকে রেফার করেন।

'কিন্তু—'

'হ্যাঁ, বল, কিন্তুটা কী?'

'শুভ্রর দাদু আপনাকে গোয়েন্দা হিসেবে নিযুক্ত যখন করলেন, তখন ওরকম একটা হেঁয়ালী করে রত্নহার কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন তা না জানিয়ে স্পষ্টই

তো বলে দিতে পারতেন।'

'বুম্বা, রাঘবেন্দ্র চৌধুরী তোমার আমার থেকে বয়েসে অনেক বড়। জীবনটা উনি আমাদের থেকে বেশি দেখেছেন। নিজের ছেলে যেখানে রত্নহারের লোভে বাপকে খুন করার হুমকি দেয়, সেখানে পৃথিবীব আর কারো ওপর কী তিনি বিশ্বাস রাখতে পারেন? তাছাড়া তিনি আমাকে চেনেনও না। একজন অপরিচিতের কাছে দুম করে কী ঐ রকম একটা দুষ্প্রাপ্য রত্নের গোপন ঠিকানা জানানো যায়? আমি লোকটা যে কতটা খাঁটি সেটা তিনি জানবেন কী করে? গোয়েন্দা সেজে আমিও তো চোর হ'তে পারতাম। তাই সরাসরি তিনি রত্নহারের হদিশ আমায় দেননি। অবশ্য এটা আমার বাস্তবভিত্তিক অনুমান। সে যাইহোক উনি আমায় জানিয়েছিলেন, যদি কোন অপঘাতে ওঁর মৃত্যু হয় আমি যেন রত্নহার খুঁজে বার করে ভাবী উত্তরাধিকারী রমেন্দ্র চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র রসেন্দ্র চৌধুরীকে হারটা পৌঁছে দিই। এমনও হ'তে পারে, আমি কতবড় গোয়েন্দা সেটা যাচাই করতে চেয়েছিলেন। সে যাইহোক, ওই একই জায়গায় তোমরাও যাচ্ছ শুনে তোমাদের সঙ্গে একটু মজা করার জন্যে ছদ্মবেশে তোমাদের সঙ্গে চললাম। রাজস্থানী পোশাক পরেও হাতে ডট্‌পেন দিয়ে ইচ্ছে করে বাংলায় লিখলাম 'র'। অর্থাৎ আমার সম্বন্ধে তোমাদের মনে একটা কৌতূহল জাগিয়ে তুললাম। তাতন আমায় ধরেও ধরতে পারেনি। আমি বাঁ হাতে লিখে ওকে চিঠি দিতাম। আমার হাতের লেখা ও চেনে। তাই হাতের লেখার ধাঁধায় পড়ে ও বেশ অসুবিধায় পড়ে গিয়েছিল।'

'ওহ্ এমন একটা মেকাপ নিয়েছিলে না,' তাতন বলল, 'আমি তো কিছুতেই বুঝতে পারিনি তোমায়।'

সামান্য হেসে নীল বলল, 'আবার চিঠির কথায় ফেরা যাক। রাঘবেন্দ্র চৌধুরীর চিঠি নিয়ে আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। কিন্তু উনি চিঠির কথা স্মরণেই আনতে পারলেন না। সন্দেহ শুরু সেখানেই। এ তো হ'তে পারে না। যে লোক আমাকে চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠালেন তিনি আমার নামই শোনেননি, এমন তো হয়না। এদিকে দেখলাম গণেশ হালদারও অনেক কিছু জেনেও না জানার ভান করছে। আসলে গণেশ বহুদিনের পুরনো কর্মচারি। সে আসল নকলের পার্থক্য ধরে ফেলেছিল। কিন্তু চৌধুরী বংশের মান সম্মানের প্রশ্নে ও চুপ করেই ছিল। আর বারবার রজত চৌধুরীকে বলেছিল আসল রাঘবেন্দ্র চৌধুরীকে বার করে দেবার জন্য।

এমন সময়ে দেখা উমা পাগ্‌লার সঙ্গে। লোকটা ঘোর উন্মাদ ছিলনা। মাঝে মাঝে বেশ ভালোই থাকত, মাঝে মাঝে পাগলামি চেপে ধরত। সুস্থ থাকলে ও সব কিছুই বুঝতে পারত। ও দেখতে পেয়েছিল রজত চৌধুরী, ডাক্তার আর বলাই-

য়ের সাহায্যে রাঘবেন্দ্র চৌধুরীকে অজ্ঞান অবস্থায় পাতালপুরীতে নিয়ে যাচ্ছে। বুম্বা, তুমি যে আংটিটা পেয়েছিলে, সেটা রজত চৌধুরীর। রাঘবেন্দ্রকে মাটির নিচের গুপ্তঘরে রেখে আসার সময়ে ওঁর হাতের আংটিগুলো খুলে নেয় রজত চৌধুরী। তারপর সেগুলো নিজের আঙুলে পরে নেয়। নিজের আংটি খুলে পকেটে রাখতে গিয়ে তাড়াহুড়োয় সেটা মন্দিরে পড়ে যায়। রাঘবেন্দ্রর থেকে রজতের আঙুল সরু। তাই আংটি ঢিলে লাগছিল। এটা অবশ্য তাতনও ধরে ফেলেছিল। ভাগ্যিস মন্দিরটা রঙ করানো হয়েছিল রাঘবেন্দ্র চৌধুরী নিখোঁজ হবার আগে, নইলে আংটিটা কিছুতেই বুম্বার হাতে আসতো না।

'উমা পাগলার একটা কিছু ঘটবে আমি বুঝতে পেরেছিলুম। কারণ যে পাগল লোক ডেকে ডেকে বলে 'চৌধুরী বাড়িতে পাপ ঢুকেছে, সব ফাঁস করে দোব,' তাকে খুন হ'তেই হবে। তবে রজত চৌধুরীর দুর্ভাগ্য, আমি সব কথা জেনে নেবার পরই উমা খুন হয়। দারোগা মিস্টার ঘোষালকে ইনফর্‌ম্‌ করতে আমার একটু লেট হয়ে গিয়েছিল। নইলে ওকে বাঁচানো যেত। তবে মরার আগে ও রজত চৌধুরীর মাথার চুল খামচে ধরে পুলিসের কাজে অনেক সাহায্য করে গেছে।

'উমার পরই কিন্তু ছিল গণেশের পালা। ছকে বাঁধা ব্যাপার। গণেশকে তো দুম্‌ করে উমার মতো খুন করা যায় না। তাহলে সন্দেহটা অনেক বেশি বেড়ে যেত। রজত চৌধুরী বুদ্ধিটা ভালোই বার করেছিল। এক ঢিলে দুপাখি মারা। রত্নহার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ রজত চৌধুরী সিন্দুক থেকে শুরু করে সব জায়গা তন্নতন্ন খুঁজেও রত্নহারের সন্ধান পায়নি। কারণ রাঘবেন্দ্র তাকে এক মোক্ষম জায়গায় সরিয়ে দিয়েছেন। সবার সামনে থেকেও সব সন্দেহের বাইরে রাখা। রাঘবেন্দ্র ডিটারমাইন্ড ছিলেন এমন কুলাঙ্গারের হাতে রত্নহার তুলে দেওয়ার থেকে মৃত্যু অনেক ভালো। মাঝে মাঝে আশ্চর্য লাগে কী বাবার কী ছেলে। সে যাই হোক, এদিকে কালী পুজো এগিয়ে আসছে, অতএব রত্নহার নিখোঁজ এটা চাওড় করতেই হবে। করা হল। সব দোষ গণেশের ঘাড়ে চাপাতে গেলে গণেশকে মেরে ফেলার থেকে গুম্‌ করে দেওয়াটাই একমাত্র পথ। কারণ তাকে খুন করলে কেসটা অন্যদিকে ঘুরে যাবে। গণেশ বিচক্ষণ আর অভিজ্ঞ লোক হওয়া সত্ত্বেও রজতের ফাঁদে পা দিয়ে বসল। গণেশ যখন ভয় দেখালো, দুদিনের মধ্যে আসল রাঘবেন্দ্রকে বার না করে দিলে ও সব কিছু পুলিসকে জানাতে বাধ্য হবে তখন রজত চৌধুরী আবার একটিলে দু পাখি মারল। রজত ওকে বলেছিল রাঘবেন্দ্র মন্দিরের নিচে চোরাঘরে বন্দী হয়ে আছেন। গণেশ মন্দিরের গুপ্ত রাস্তার খবর জানতো। সে রাত্রে ও ওর প্রভুকে উদ্ধার করতে একাই নিচে নেমে গিয়েছিল। কিন্তু আর ফিরতে পারেনি। রজত চৌধুরী ভারতবর্ষে ফিরে দুজনকে হাত করেছিল টাকার লোভ দেখিয়ে। একজন ডাক্তার মুখার্জি। অন্যজন বলাই। একার পক্ষে

তো আর সব কাজ করা সম্ভব নয়। জেলে না গেলে একদিন রজতের হাতে দুটোই মারা পড়ত। তাছাড়া লোকচক্ষু এড়াতে ভবিষ্যতে যাকে অসুস্থ হবার ভান করতে হবে তাকে একজন ডাক্তার তো সঙ্গে পেতেই হবে। প্রায় অন্ধকার ঘরে দিনরাত কাটাতে গেলে কমপ্লীট বেডরেস্টের মতো একটা রোগ বাধাতেই হবে। আর হার্ট অ্যাটাক করলে কারোরই কোন সন্দেহ থাকে না।'

নীল আর একটা সিগারেট ধরাবার জন্যে থামল। এই অবসরে শুভ্র জিজ্ঞাসা করে, 'কিন্তু ঘর অন্ধকার করে রাখার কারণ কী?'

'দুটো কারণ। প্রথম কারণ, রত্নহারটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুঁজে বার করতে গেলে দিনরাত খুঁজতে হবে। সে এক অখণ্ড অবসরের কাজ। আর দ্বিতীয় কারণ, রাঘবেন্দ্র চৌধুরী র বড় বড় সাদা দাড়ি আর চুল। তা পরচুলা পরে সবার সামনে তো দিনরাত ঘোরা যায় না। ব্যস্ আমার বলা শেষ। এবার তোমাদের প্রশ্ন থাকলে করতে পার।' .

শুভ্রই প্রথম হাত তুলল, 'আগে ধাঁধাটা ক্লীয়ার করুন কাকু।'

'হ্যাঁ, ধাঁধা! তার আগে ছড়ার ব্যাখ্যা। তাতন, ওটা তুই-ই বল। কারণ তুই ওটা সল্ভ করেছিস।' .

• 'আমি কী আর তোমার মতো গুছিয়ে বলতে পারব। ঠিক আছে চেষ্টা করছি।' বলে তাতন ব্যাখ্যা শুরু করল। সূত্রের ছড়াটা মনে আছে।

খুঁজে খুঁজে হয়রান
হও কেন ম্রিয়মান?
নয়ন মোছ যতবার
রাকেশ হাসে ততবার।

ছড়াটার সরল মানে করলে কী দাঁড়ায়? কেউ হয়ত কিছু খুঁজছে। এবং খুঁজতে খুঁজতে হয়রান। কিন্তু পাচ্ছে না। না পেয়ে সে ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে। কী খুঁজছে এক্ষেত্রে নিশ্চয় সেটা বলে দেবার দরকার নেই। সে খুঁজতে চাইছে রত্নহার। এইবারে আসল সূত্র। নয়ন মোছ যতবার রাকেশ হাসে ততবার। নয়ন, নয়ন মানে চোখ। চোখ যতবার মুছবে ততবারই রাকেশ মানে চাঁদ, চাঁদ হাসবে ততবার। এর কী অর্থ হয়? চোখ মোছার সঙ্গে চাঁদের হাসির কী সম্পর্ক? নেহাতই আবোল তাবোল ব্যাপার। কিন্তু না। অর্থটা খুবই গভীর। চট্ করে মাথায় আসবে না। আমার তো আসত না যদি না চিঠিতে নীলকাকু একটা সমাধানের রাস্তা ধরিয়ে দিত। চিঠিতে নীলকাকু লিখেছিল, ছেলেবেলায় এক দুই পড়া শিখেছিলাম কী করে। হ্যাঁ, আমি তোদেরও জিগ্যেস করছি, কী ভাবে শিখেছিলি?'

বুম্বা বলে উঠল, 'খুব সহজ, একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র—'

'ব্যস', ওকে থামিয়ে তাতন বলল, তিনে নেত্র—নেত্রর আর কী কী প্রতিশব্দ

আছে—

এবারও বুম্বার উত্তর, 'চোখ, অক্ষি, লোচন, নয়ন—'

'ইয়েস, নয়ন, কারণ আমরা ছড়ায় পেয়েছি নয়ন—নয়ন কিসে হয়?'

'কিসে হয় মানে? তিনে নেত্র—' বুম্বার সহজ জবাব।

'অর্থাৎ, নয়ন মোছ, মানে তিন মোছ। তার পরের লাইন কী বলছে?'

'রাকেশ হাসে ততবার। রাকেশ মানে চাঁদ, মানে চন্দ্র।'

'চন্দ্র আসছে কতয়? বুম্বাই বল।'

'একে চন্দ্র।'

'তাহলে, এক হাসে মানে আসে ততবার। এ পর্যন্ত ক্লীয়ার তো? এবার এই প্রসেসটা অ্যাপ্লাই কর ঐ এলোমেলো, কোন মানে হয় না এমন শব্দগুলোর ওপর।'

শুভ্র নীরবে সব শুনে যাচ্ছিল। হঠাৎ ও তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল, 'পেয়েছি, এতক্ষণে ক্লীয়ার। তাতন, নীলকাকুর ধাঁধার চিঠিটা দে।'

তাতন কিছু না বলে চিঠিটা এগিয়ে দিল।

চিঠিটা অর্থাৎ ধাঁধার কাগজটা নিয়ে শুভ্র বলল, নয়ন মোছ, মানে তিন মোছ, অর্থাৎ তিন অফ্ করলেই রাকেশ হাসবে, অর্থাৎ, প্রথম শব্দ স্বাধীনতা। স্বাধীনতার তিন বাদ মানে প্রথম তিন অক্ষর যদি বাদ দিই, তাহলে হাসছে মানে থাকছে এক, মানে তা...। দ্বিতীয় শব্দ ধ্যানজ্ঞান। ধ্যানজ্ঞানের তিন বাদ দিলে...রইল ন।'

বলেই ও নিজের মনে পর পর তিনটি অক্ষর বাদ দিয়ে পড়তে থাকল, স্বাধীনতা ধ্যানজ্ঞান, ষড়রিপু তালহারা, মোটাসোটা নটবর, আয়ভিখু ভুষিমাল, খাইগিলে বারমুডা, ঝালাপালা, আচ্ছা! সব মিলিয়ে দাঁড়ালো, 'তানপুরাটার খুললে ডালা'। এবার, আমি তুমি, হেলেদুলে যাবিতো যা, খাবেদাবে বারবার, নহবত খানদান, রামাশ্যামা হেলাফেলা দিয়ে দাঁড়াচ্ছে, 'মিলে যাবে রতনমালা'।

লাফিয়ে উঠল বুম্বা, 'পুরোটার মানে হ'ল তানপুরাটার খুললে ডালা, মিলে যাবে রতনমালা! অর্থাৎ শুভ্রর দাদু রত্নহারটা তানপুরাটার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন?

'হ্যাঁ বৎস' বলে তাতন মুচকি দিয়ে হাসল।

'সাবাস দাদু—ঘি দুধ খাওয়া ব্রেন তো, জব্বর ধাঁধা। সারাজীবনেও আমি এটা সল্‌ভ্ করতে পারতুম না।'

বুম্বা ধীরে সুস্থে বসে পড়ে। তাতনও চুপ করে গেল। নীল আবার বলতে শুরু করল, 'তোমাদের সবার সামনেই তো রাঘবেন্দ্র চৌধুরী তানপুরা খুললেন। রত্নহার সবাই দেখেছ।'

'উঃ দারুন!' বুম্বার নতুন অ্যাডিশান, 'ওই টুকু একটা হার থেকে যে এত আলো বের হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সত্যি শুভ্র, এখানে

এসে আমাদের ওটাই লাভ। আমারই নিয়ে নিতে ইচ্ছে করছিল।'

নীল রসিকতা করে জিগ্যেস করল, 'নিয়ে কী করতে?'

'ঘরে সাজিয়ে রাখতুম। অ্যান্টিক হিসেবে দারুণ মূল্যবান।'

'ও লাভটা ছেড়ে দাও। তবে রত্নহার দেখে তোমাদের মানসিক লাভ নিশ্চয় হয়েছে। সঙ্গে কিছু অর্থকরী লাভও হয়েছে।'

'কী রকম?' তাতনের প্রশ্ন।

'রাঘবেন্দ্র চৌধুরী একটু আগে পারিশ্রমিক বাবদ আমাকে একটা দশহাজার টাকার চেক দিয়েছেন।'

'খুব ভালো,' বুম্বা সোৎসাহে বলল, 'আমাদের কিন্তু একদিন চাইনীজ খাওয়াতে হবে নীলকাকু।'

'ব্যস্, এই তোমাদের চাহিদা?'

'আর কী চাহিদা থাকতে পারে?'

'পারে। এই অভিযানে তোমাদের তিনজনের অবদান কিছু কম নয়। সাত আমার তিন তোমাদের তিনজনের। আমি বেশি খেটেছি তাই সাত আমার। তোমরা কম খেটেছ তাই তিনজনের তিন। সোজা হিসেব।

বুম্বা চেঁচিয়ে উঠল, 'থ্রী চিয়ার্স ফর নীলকাকু, হিপ্ হিপ্ হুররে...।'

তাতন বুম্বার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে বলল, 'দাঁড়া দাঁড়া, আমার আরো তিনটে প্রশ্ন আছে—রজত চৌধুরী জার্মানী ছেড়ে এখানে এসেছিলেন কী শুধু ঐ রত্নহারের লোভে?'

'হ্যাঁ, মেন্‌লি ওটাই কারণ। তবে পরোক্ষ কারণও আছে। রাঘবেন্দ্র চৌধুরীর মুখ থেকেই সব শোনা। প্র্যাকটিক্যালি, রাঘবেন্দ্র ও রমেন্দ্র'র মধ্যে মনোমালিন্যের কারণ ঐ রজত। ও ছোলেবেলা থেকেই বকে যাওয়া ছেলে। হাতটান রোগটা ছিল স্কুল লাইফ থেকেই। আসলে প্রচণ্ড অর্থলিপ্সাই হয়েছিল কাল। বড় হতে সেটা ক্রমশ বাড়তে থাকে। কিছু কিছু ছেলে থাকে যাদের পয়সা নিয়ে চালবাজি করা বা দেখানোটা একটা অভ্যেস অথবা বিলাসিতাও বলতে পারিস। রজতও ঠিক সেই ধরণের। যত বয়েস বাড়তে থাকে ততই ওর অর্থতৃষ্ণা বেড়ে চলে। একদিন রমেন চৌধুরীর স্ত্রীর একটা সাতনরি হার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। তাই নিয়ে রমেনবাবু বাধ্য হন কিছু কথা বলতে। যেটা রাঘবেন্দ্রর আঁতে ঘা দেয়। তিনিও ছেলের পক্ষ নিয়ে দুচার কথা শোনাতে ছাড়েন না। ফলে দু ভাইয়ের মধ্যে মহলা ভাগাভাগি হয়ে যায়। এরপর রাঘবেন্দ্র আর ছেলেকে নিজের কাছে না রেখে চেষ্টা করে পাঠিয়ে দিলেন জার্মানী, চাকরি সমেত।

'কিন্তু যে খারাপ পথে চলতে চায় তাকে ভালোর দিকে ফেরানো মুশকিল। শিক্ষানবিশীর কটা টাকায় রজতের পক্ষে চলা সম্ভব হচ্ছিল না। এবং সেখানেও

চুরি করে জেল এবং চাকরি নট্। অতঃপর, ও ভিড়ে গেল স্মাগলারদের দলে। এতে দুপয়সা হাতে এলেও পুলিসের নজরে চলে এল কিছুদিনের মধ্যেই। শেষকালে তার দেশ ছাড়ার মত অবস্থা। কিন্তু জার্মানী ছাড়ার আগেই ওর মনে পড়ে গেল রত্নহারের কথা। তাছাড়া তাড়া খেতে খেতে ও তখন প্রচণ্ড অর্থকষ্টের মধ্যেও ছিল। কোন রকমে প্যাসেজ মানি জোগাড় করে দেশে ফিরে আসে। রত্নহারের পাথরের দাম যাই হোক না কেন ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে রত্নহার অমূল্য। এবার তোর দ্বিতীয় প্রশ্ন কী?'

'নকল রাঘবেন্দ্র চৌধুরীকে তুমি চিনতে পারলে কী করে?

'ওই চিঠি। আসলে রাঘবেন্দ্র চৌধুরী যে কিড্ন্যাপ্ড্ হবার আগেই আমাকে আর শুভ্রকে চিঠি দিয়েছিলেন এটা রজত জানত না। আমাদের ইনভাইট করার ব্যাপারটা না জানাই ওর পক্ষে মৃত্যুবান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সন্দেহ শুরু সেখানেই। তারপর উমা পাগ্লাকে জেরা করে করে জানতে পেরেছিলাম রাঘবেন্দ্রর মেজো ছেলে রজত ফিরে এসেছে। তাহলে সে গেল কোথায়? তারপর, একটা লোক, কতটা রোগা হলে তার আঙুলের আংটি ঢিলে হয়ে যায়? সেই তুলনায়, তোরা কেউ লক্ষ্য করেছিলি কিনা জানিনা, যতই সাদা দাড়ি গোঁফের আড়ালে নিজেকে লুকোবার চেষ্টা করুক না কেন, মুখের চেহারায় ছদ্মবেশীকে কিন্তু অতটা সিক্ বলে মনে হচ্ছিল না। গালে বা কপালে একটা ভাঁজ পর্যন্ত পড়েনি। আর সর্বশেষ এবং ডেফিনিট প্রমাণ হাতের লেখা। চালাকি করে গণেশ হালদারের নিখোঁজ হওয়ার সংবাদটি ও নিজের হাতে লিখে দারোগা ঘোষালের কাছে পাঠাতে গিয়েই নিজেকে ধরিয়ে দিয়েছিল। রাঘবেন্দ্র আর রজতের চেহারার যতই মিল থাক হাতের লেখা একেবারেই আলাদা।'

ঘাড় নেড়ে সায় দিতে দিতে তাতন বলল, 'হ্যাঁ নীলকাকু, ঐ হাতের লেখা দেখেই আমি আর শুভ্র বুঝতে পেরেছিলুম উনি আসল রাঘবেন্দ্র চৌধুরী নন। আসল রাঘবেন্দ্র চৌধুরীর শুভ্রকে লেখা চিঠি যে আমাদের সঙ্গেই ছিল। আচ্ছা, এবার আমার তৃতীয় প্রশ্ন, তুমি হঠাৎ হাতে 'র' লিখতে গেলে কেন?'

এবার নীল হেসে ফেলে। বলে, 'র' স্ট্যান্ডস্ ফর রহস্য। সামনে তখন বিরাট রহস্য। এনি মোর কোয়েশ্চন?'

তিনজনেই সমস্বরে বলল, 'না।'

হাতের টুস্কি দিয়ে সিগারেটের শেষাংশ জানলার বাইরে ছুঁড়ে দিয়েই ঝপ্ ঝপ্ করে কাচের সাটার দুটো নামিয়ে দিল নীল। বাইরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। কে জানে ময়নাডাঙ্গার মেঘ উড়ে এসে এখানেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হয়ে নামল কিনা!